মাটির ক্ষুধা

বেদুইন

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম সাহিত্য প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০০৮
প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৩৭২
প্রকাশক ঃ প্রবীর মিত্র ঃ ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ঃ কলকাতা-৭০০ ০০৯
প্রচ্ছদ ঃ নিতাই দাস
মুদ্রণ ঃ তনুশ্রী প্রিন্টার্স ঃ ২১বি রাধানাথ বোস লেন ঃ কলকাতা-৭০০ ০০৬

চাষী-মজুরের অধিকার রক্ষায় অগ্রদূত

সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে

বেশি দূর নয়। কলকাতার পাশেই। পঞ্চাশ মাইল পথও পেরোতে হয়নি। দু'ঘণ্টার পথ অথচ পঞ্চাশ মাইল পথ চলতে সারা সকাল কেটে দুপুরের রোদ গড়িয়ে পড়েছে বিকালের দিকে। মনে হচ্ছিল চলার বুঝি শেষ নেই।

অবশেষে নদীর কিনারায় এসে থামতে হল। খেয়ার নৌকা তখন ওপারে। অপেক্ষা করতেই হবে অথচ সন্ধ্যার আগেই নদী পেরোতে হবে। কাজের বিশেষ তাড়া না থাকলেও মহিলা সহযাত্রী নিয়ে চলাচলের দুর্ভোগটা কম নয়। বিশেষ করে, যদি গন্তব্যস্থানে পৌঁছে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করিতে পারি সেটাই হবে পরম লাভ। যার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করার কথা সেই অতিথিপরায়ণ ব্যক্তিটিও নিশ্চিন্তে দুটো ভাত ফুটিয়ে দিতে পারবে সময় মত।

লোক প্রবাদ, man proposes but God disposes। আমাদের অবস্থাও সেই রকম। আমরা নদী পেরোতে চাইলেও নদী যেন আমাদের প্রতি বিমুখ। আমাদের পার করার পাটনী তখন নদীর ও-কূলে, আমরা আকুল হলেও পাটনী এ-কূলে তরী ভেড়াতে মোটেই ব্যাকুল নয়। ডাঙ্গায় বসে ডিঙ্গির প্রত্যাশা ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই কিন্তু পাটনী তখন খেয়ার পাট তুলে ঘরে ফেরার ধান্দায় ব্যস্ত, এ-পার থেকে ও-পারের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বুঝতে কষ্ট হল না। পাটনী মোটেই সদয় নয়। নির্দয়ের মত এপারের মানুষদের পেছনে রেখে গামছা মাথায় জড়িয়ে ডিঙি খুঁটোয় বেঁধে ঘরের পথ ধরেছে।

হতাশভাবে ভারতী বলল, মাঝি আর আসবে না মনে হচ্ছে।

ইসুফ বলল, তাইতো মনে হচ্ছে।

নদী ছোট হলে কি হবে! জোয়ারের টানে ছোট নদী তখন পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত, স্রোতটাও প্রখর। সূর্যাস্তের পর পাটনী আর খেয়া দেয় না। আইনের বান্দা মাঝি আইনকে সম্মান করতেই এপারের যাত্রীদের ভ্রূকুটি করে ঘরে ফিরে চলেছে। অন্নদামঙ্গলের অন্নদার মত তারস্বরে চিৎকার করছিল ভারতী। তার চিৎকারে ছিল মিনতির সুর। কিন্তু বৃথাই ভারতীর আবেদন। অন্নদামঙ্গলের ঈশ্বরী পাটনীর মত ত্বরায় নৌকা আনল না বামা স্বর শুনি। আমরাও এতটা

পথ হেঁটে এসে নিরাশ হলাম, কপালে যে আরও দুর্ভোগ আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না।

হতাশভাবে ভারতী মাটির ওপর বসে পড়ল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভাবছ ভারতী?

ভারতী বলল, আর চেঁচিয়ে লাভ নেই। এবার রিটার্ণ টিকিট কাটতে হবে। তোমার ঢিলেমির জন্য এই হাল হল, এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল।

বললাম, তোমার উপদেশ শিরোধার্য।

ভারতী বেশ মোলায়েম সুরে বলল, ও কেন এল না জানো?

কেমন করে জানব। এদেশের সঙ্গে আমার পরিচয়ই নেই, জানাজানি তো অনেক দূরের কথা। মোটমাট বুঝেছি আজ আর গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো যাবে না।

ভারতী নিজের মনেই বলল, বাদার পারঘাটায় পয়সা দেয় না কেউ-ই সরকারী ব্যবস্থায়, কোথাও বা স্থানীয় ব্যবস্থায় পারঘাটা জনসাধারণের জন্য ফ্রি। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি নদী পারাপার। সূর্য ডুবলেই খেয়া বন্ধ। এই ঘাটের পাটনী আইন মেনে চলে। সূর্যাস্তের আগেই ঘরে ফিরে গেছে।

ইসুফ বলল, আজকের সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষ ঘোরতর হিসাবী হয়েছে। লাভ-লোকসানের খতিয়ান করে তবেই পদক্ষেপ করে। পারঘাটার মাঝি জানে, সন্ধ্যা অবধি পারাপার করলে একটা ছিদেমও তার লাভ হবে না। অতএব আইন অনুসারে সে স্বগৃহে বহাল তবিয়তে প্রত্যাবর্তন করেছে। বুঝলেন তো।

বললাম, তোমাদের সদুপদেশ তথা অমৃতবাণী আমার হৃদয় কন্দরে চিরকাল বিরাজ করবে। দেখা যাক অন্য কোন পথ পাওয়া যায় কিনা।

ভারতী বলল, দ্বিতীয় পথ হল সন্তরণ।

ইসুফ বলল, জোয়ারের ঘোলা জলে কামট আর কুমীর আমাদের অভ্যর্থনা করবে, সেটা কিন্তু ভুললে চলবে না।

বললাম, আর তো কোন পথ দেখছি না।

ভারতী হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বলল, আছে পথ। যেখানে মুস্কিল সেখানেই আসান। যাদৃশ ভাবনা তাদৃশী সিদ্ধি।

বললাম, অর্থাৎ?

তাকিয়ে দেখ। চোখ বুঁজে থাকলে চলে না। দেখতে পাচ্ছ? ঐ দিকে তাকাও।

তাকিয়ে দেখলাম দূরে পাল তুলে একটা নৌকা দ্রুতবেগে জোয়ারের জলের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে আসছে।

ভারতী বলল, দেখছ তো একটা পালতোলা নৌকা জোয়ারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে আসছে। ওটাকে থামাতে পারলে ওপারে যেতেও পারি।

বললাম, এটাও তো আমাদের উপেক্ষা করে চলে যেতে পারে।

ইসুফ বলল, অসম্ভব নয়! নদীর কিনারায় ওরা সহজে নৌকা ভেড়ায় না। লোকের হাতছানিতে নৌকা ভিড়িয়ে সর্বস্ব হারাবার ঘটনা হাজার বার ঘটেছে বাদার নদীতে। ডাকাতির ভয়ে ওরা মাঝ গাং বরাবর নৌকা রাখে, সহজে কিনারায় নৌকা ভেড়ায় না। বিশেষ করে সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসছে, এ-সময়ে ওরা সতর্ক হয়েই চলবে।

ভারতী এই অঞ্চলের মেয়ে। সে-ও জানে নদী পথের বিপদ। ইসুফের গলায় গলা মিলিয়ে বলল, ঠিক কথা বলেছ ইসুফ। তবুও চেষ্টা করব। চেষ্টার অসাধ্য নাকি কিছু নেই। যদি নৌকা না ভেড়ায় তা হলে ফিরতি পথ ধরতেই হবে।

বললাম, নিরুপায়ের গতি।

ভারতী হেসে বলল, অগতির গতি।

নৌকাটা নিকটবর্তী হওয়া মাত্র ভারতী আঁচল উড়িয়ে মাঝিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বার বার চেষ্টা করতে থাকে। আমরাও গলা-ছেড়ে হাঁক দিতে থাকি।

মহাজনের বজরা। কোন গঞ্জ থেকে মাল নিয়ে এগিয়ে চলেছে। দুজন দাঁড় টানছে। একজন হাল ধরে আছে। আমাদের আবেদন-নিবেদন অগ্রাহ্য করে মহাজনী বজরা এগিয়ে যেতে থাকে। আমরাও কেমন হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখি বজরার মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে মাঝিরা। ক্রমেই আমাদের দিকে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল। এতক্ষণে বুঝলাম, আমাদের আবেদন মাঝিদের হৃদয় স্পর্শ করেছে। এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে বজরায় পা দিলাম। সামান্য সাহায্য। নদী পার করে দেওয়া। ওদের পক্ষে সামান্য কাজ, অথচ আমাদের পক্ষে বিরাট সাহায্য।

বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা নদী পেরিয়ে পঞ্চাশটা পয়সা দিলাম মাঝিদের

হাতে। তারা হয়তো আশাই করেনি এ ভাবে তাদের কাজের মূল্য পাবে আমাদের কাছে। দশ মিনিটের এই পথ পেরোতে না পারলে অনেক দুর্ভোগ যে পোহাতে হত সেটা বুঝেই আমরা বার বার কৃতজ্ঞতা জানাতে থাকি বজরার মাঝিদের।

মাটিতে পা দিয়েই ভারতীর চেহারা বদলে গেল। পারাপারের খেয়ার নৌকার কাছে গিয়ে বলল, বদমাশ পাটনীকে কিছু শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে।

হেসে বললাম, সে তো আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

তার নৌকাটা তো মজুদ আছে। এবার নৌকাটাকে মাঝ গাঙ্গে ঠেলে দেব মনে করছি। এই জোয়ারে নৌকা নিজের চালে ভাসতে ভাসতে কয়েক মাইল এগিয়ে যাবে। সকালবেলায় বদমাশটা মাথায় হাত দিয়ে বসবে।

বললাম, তামাসাটা মন্দ জমবে না। কিন্তু আগামীকাল সকালবেলায় ঘাটে নৌকা না পেলে পারাপারের যাত্রীরাই বেশি বিপন্ন হবে। একজনের অপরাধে বহুজনকে শাস্তি দেওয়া উচিত হবে কি?

ভারতী তীক্ষ্ণস্বরে বলল, তোমার নীতি-ধর্মের পচা যুক্তিগুলো এখন শিকেয় তুলে রাখ। যারা বিপন্ন হবে তারাই শায়েস্তা করবে পাটনীকে। পাটনীও জানবে ও বুঝবে। ভবিষ্যতে এমন অন্যায় আর করবে না।

হেসে বললাম, হিংসা দিয়ে হিংসা রোধ করা কি যায়?

বেশ বলেছ। হিটলার বন্দুক-কামান নিয়ে দেশ দখল করছিল। তাকে বাধা দিতে অহিংসর নামাবলী গায়ে জড়িয়ে মিত্র-শক্তি ইষ্টনাম জপ করলে অবশ্যই সমস্যার সমাধান হত না। বন্দুকের মোকাবিলা বন্দুক দিয়েই করতে হয়। যেমন কুকুর তেমন মুগুর। এটাই হল ন্যায় ধর্ম। যারা অন্যায়কারীর প্রতি অনুকম্পা বোধ করে তারা দুর্বল অথবা কাপুরুষ। অন্যায়কে প্রশ্রয়দানকারীকে মার্জনা করা উচিত নয়। আমি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে রাজি নই। পাটনীর নৌকা ভাসিয়ে দাও, পাটনী শিক্ষালাভ করুক।

বললাম, পথেঘাটে শিক্ষিকার ভূমিকা গ্রহণ আমার রুচি বিরুদ্ধ।

তোমার রুচি তোমার থাক। ইসুফ ভাই দাও তো নৌকাটা ভাসিয়ে। আমরা দুজনে নৌকাটা ঠেলে দিচ্ছি। তুমি তোমার রুচি-নীতি ধুয়ে খাও।

ইসুফ অতটা নিষ্ঠুর হতে পারল না। ভারতীর যুক্তিকে স্বীকার করলেও পাটনীর খেয়া নৌকাটা জোয়ারের জলে ভাসিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাল না। গম্ভীরভাবে বলল, দিদির যুক্তি আমি মেনে নিচ্ছি, তবে এবারের মত

ফরগিভ্ এবং ফরগেট। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এবার জোরে পা চালাতে হবে। আমাদের গন্তব্যস্থল যে কোথায় তাও জানা নেই। ফাঁকা মাঠ, আশে পাশে গ্রামের চিহ্ন নেই। কখন যে পৌঁছাব তার ঠিক নেই। অতএব, আমার মনে হয় ওসব চিন্তা বাদ দিয়ে দ্রুত তালে পা ফেলে এগিয়ে চল।

ভারতী কি যেন ভেবে নিজে নিজেই হেসে উঠল। তারপরই বলল, চল।

চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলাম, হাসলে কেন?

লোক প্রবাদ নারী দুর্বলা। দেখছি পুরুষ-ই অবলা।

কোন জবাব দিলাম না। মন্তব্যটা যে মধুর নয় এবং পরবর্তী অধ্যায়ে কথার জোয়ার যে বইয়ে দেবে বুঝতে পেরে নীরবে পা ফেলতে থাকি।

নদীর কিনারা থেকে কিছুটা তফাতে বিরাট বটগাছ। বটগাছের আড়ালে রয়েছে কতকগুলো খড়ের বাড়ি। ছোট্ট একটা গ্রাম। গ্রামের দৈর্ঘ আছে প্রস্থ নেই, কেমন যেন ছন্নছাড়া।

সূর্য তখন পাটে বসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নামবে আমাদের গন্তব্যস্থলের হদিস করতে হবে সন্ধ্যার আগেই।

সামনের খড়ের বাড়ির দাওয়াতে বসে শীর্ণকায় এক ব্যক্তি ভেজা খড় দিয়ে দড়ি পাকাচ্ছিল। তাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলাম, নয়নসুক গ্রামটা কোথায় বলতে পার?

লোকটার চেহারা আর তার ঘরের চেহারা একই রকম। ভাঙ্গা খড়ের চালা যেমন আকাশের দিকে মুখ উঁচিয়ে করুণা ভিক্ষা করছে, তেমনি করুণা কাঙ্গাল মুখ তুলে লোকটি জিজ্ঞাসা করল, কত নম্বরে?

আমি বুঝতে না পারলেও ইসুফ বুঝেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বলল, তাতো জানি না। আমরা যাব সুশীল নস্করের বাড়ি।

কোন্ সুশীল? রামচরণের ছেলে?

জানি না। তবে মাস্টারি করে।

ও তাই বল। এখানে অনেক সুশীল রয়েছে। ঠিক ঠিক সুশীল খুঁজতে হলে বাবার নাম জানা দরকার। মাস্টার সুশীল হল মঙ্গলের ছেলে। আট নম্বরে থাকে।

আট নম্বর কত দূর?

সামনে ছ মাইল, ডানে ছ মাইল, বাঁমে ছ মাইল, এই হল নয়নসুকের চৌহদ্দি। নয়নসুকের দশটা লাট। দশটা লাটের আট নম্বরে যেতে হবে।

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এদিকে এস। ফাঁকায় দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।

সবাই লোকটার পেছন পেছন ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। হাত বাড়িয়ে শীর্ণ লোকটা বলল, ওই যে দুটো তালগাছ দেখতে পাচ্ছ। বাঁধ বরাবর গেলে ওই তালগাছের কাছে পৌঁছবে। ওখানে গিয়ে ডানের রাস্তা ধরবে। সেখান থেকে ক্রোশটেক এগিয়ে গেলেই আট নম্বর।

মনে মনে হিসাব করে দেখলাম, বাঁধ বরাবর জোড়া তালগাছ পৌঁছতে পাকা তিন মাইল পথ হাঁটতে হবে। তারপর এক ক্রোশ অর্থাৎ আরও দু' মাইল। বর্তমান হিসাবে পাঁচ মাইল হলেও আশঙ্কা হচ্ছে ছয় মাইল চলতে হবে। গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে আরও দু' ঘণ্টা প্রয়োজন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ছটা বেজেছে, আরও দু ঘণ্টা চললে আটটা বাজবেই। অন্ধকার রাতে ছ' মাইল পথ চলতে আরও আধঘণ্টা বেশি প্রয়োজন হবে। মনে মনে বেশ অসোয়াস্তি অনুভব করছিলাম। এতটা পথ আমাদের সামনে, অথচ আশা করছিলাম সন্ধ্যার মধ্যেই যথা স্থানে পৌঁছানো যাবে। এখন দেখছি আশা আর নিরাশার লড়াইতে নিরাশার জয়লাভ ঘোষিত হচ্ছে।

ধন্যবাদ জানালাম।

ভারতী বলল, জল পাওয়া যাবে? খাবার জল।

শীর্ণকায় ব্যক্তিটি উৎসাহের সঙ্গে বলল, নিশ্চয় পাওয়া যাবে। তবে মা. আমাদের তো গেলাস-বাটি নেই, ভাঁড়ে খেতে হবে। এস আমার সঙ্গে, গড়িয়ে নাও কলসী থেকে।

লোকটির পেছন পেছন ভারতী খড়ের চালার নিচে প্রবেশ করল।

ভারতী জল খেয়ে ফিরে এল।

বললাম, পিপাসা মিটল?

ভারতী বলল, তৃষ্ণা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিসের তৃষ্ণা?

জলের তৃষ্ণা নয়! জলের পিপাসা মিটেছে ঠিকই, জ্বালার পিয়াস বেড়েছে!

কবিত্ব রাখ। এবার পথ চলার জন্য প্রস্তুত হও।

শীর্ণলোকটি মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, তোমাদের অনেকটা পথ যেতে হবে। রাতেরবেলায় কষ্ট হবে। রাস্তাঘাট তো ভাল নয়। তার চেয়ে—বলেই লোকটি থেমে গেল।

সে সব জেনেই তো রওনা হয়েছি ভাই। কষ্ট না করলে কি কেষ্ট পাওয়া যায়।

বলছিলাম তার চেয়ে আজ রাতটা এখানে থাক। কাল সকালে যেও।

তোমার তো এই ঘর। নিজের শুতে জায়গা নেই। বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে হয়রান হতে হয়। তার উপর আরও তিনজন। উপরি রয়েছে পেটের দায়। রাত কাটবে, পেট তো চুপ করে থাকবে না।

কেমন যেন মিইয়ে গেল লোকটা।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি ভাই?

সুধীর মুনডা।

এটা কি তোমার পৈতৃক বাড়ি?

সুধীর মুনডা আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তুলে বলল, আমি চালের জোগাড় করছি, তোমরা দাওয়াতে বসে বিশ্রাম কর।

অভাবিত ভাবে এই আশ্রয়। আমাদের প্রতিবাদ করার অবকাশ না দিয়ে সুধীর মুনডা এগিয়ে গেল বটগাছ পেরিয়ে।

ভারতী বলল, খড়ের গাদায় শুতে হবে।

ইসুফ বলল, চাদর পেতে নেব।

মাটির একটা হাঁড়ি, একটা কলসী আর গোটা তিনেক মাটির ভাঁড় বিনা কোন বস্তু নেই ঘরে। চালের চার আনা অংশে খড় নেই। চাঁদের আলো, সূর্যের তেজ সব কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ উঁকি দেবে ফুটো খড়ের চাল দিয়ে।

বললাম, তথাস্তু। তবুও তো আশ্রয়। রাতেরবেলায় পথ চলার হাঙ্গামা থেকে তো রেহাই পেলাম। আশ্রয়ের চেয়ে বেশি মূল্যবান হল এই লোকটির সারল্য আর দরদভরা মন। এটাকে অসম্মান করা উচিত হবে না।

ইসুফ বলল, ডাকাতের সাঙ্গাত নয় তো?

আশ্চর্য নয়। আদর করে রাতে বসবাস করতে দিয়ে সব কিছু লোপাট করার মতলব থাকা বিচিত্র নয়। হয়ত পৈতৃক প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরতেও পারব না। তার চেয়ে এখনও পথ ধরা উচিত। দু ঘণ্টা পথ চলতে পারলে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছতে পারব।

ভারতী বলল, না। এখানেই থাকব। মানুষকে অত ছোট মনে করতে নেই ইসুফভাই।

বেশি বড় মনে করার সুযোগ আমরা হারিয়েছি দিদি।

তবুও বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা নিয়েই সমাজে বাস করতে হবে। সব সময় যদি মনে হয় মানুষ মাত্রেই ঠগ্-জোচ্চোর-খুনে-বদমাইশ কালোবাজারী তা হলে নিজের বিবেককে যেমন গলা টিপে মারতে হয় তেমনি অশান্তির আগুনে জ্বলতে জ্বলতে খাক্ হয়ে যেতে হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যে সুধীর মুনডা ফিরে এল। হাতে একটা ছোট্ট পুঁটুলি।

চাল পেলে?

পেয়েছি।

এখানে চালের দর কত?

সাড়ে পাঁচ টাকা পালি। আপনাদের আড়াই কে-জি।

ভারতী হাত ব্যাগটা খুলে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে সুধীরের হাতে দিয়ে বলল, শুধু চাল দিয়ে তো হবে না। কিছু ডাল তরকারির ব্যবস্থাও কর।

রাতেরবেলায় ভারতী রাঁধতে বসেছিল। চাল-ডাল-আলু আর নটেশাক নুন কাঁচালঙ্কা সহযোগে সেদ্ধ করে উপাদেয় ভোজ্যবস্তু প্রস্তুত করে কচুপাতায় সাজিয়ে দিল।

পাশাপাশি চারজন বসে এই অমৃততুল্য আহার্য গ্রহণ করছিলাম নীরবে।

নীরবতা ভঙ্গ করে আমি বললাম, এটা কি তোমার পৈতৃক বাসস্থান?

সুধীর মুনডা বলল, সাত পুরুষের ভিটা নয়। তবে আমার বাবা এই বাড়িটা করেছিল।

সুধীর মুনডা বলতে থাকে।

শুনেছি ছোটনাগপুরের কোন জেলায় আমাদের বাড়ি ছিল। আমরা ছিলাম জংলী লোক। একশ' বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ এসেছিল জঙ্গল কেটে আবাদ করতে। ইংরেজ সরকার নাকি বলেছিল, তোরা যতটা জমিতে ফসল করতে পারবি, ততটা জমি তোদের।

গরীব লোক জঙ্গলের মৌ খেয়ে যাদের দিন কাটে, মকাই, চানা যাদের কাছে পোলাও, কালিয়া তারা জমির নেশায় ছুটে এসেছিল এই অঞ্চলে।

সুঁদুরী-গরাণ-আরও কত গাছের তখন সমারোহ ছিল এই আবাদে। আজ তো গাছ দেখতেই পাওয়া যায় না। তখন ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল আর বাঘ-কুমীর হরিণ-বনবিড়াল ভর্তি ছিল। বাঘের সঙ্গে লড়াই করে, কুমীরের সঙ্গে কুস্তী

করে আমাদের পূর্বপুরুষরা জমি হাসেল করল, আবাদ করল। তারপর কি যেন হয়ে গেল। ওরা প্রথমে বুঝতে পারেনি। বুঝেছিল অনেক পরে।

বেইমান ইংরেজ সরকার বড়লোকদের ইজারা দিল লপ্তে লপ্তে। নাম হল লাট আর মালিক হল লাটদার। যারা জমির আসল মালিক তারা হল ভাগচাষী। সে ভাগও আধা আধি। পঞ্চাশ বছর না পেরোতেই দেখা গেল, যারা ছিল জমির মালিক তারা হয়েছে ভিখারী আর যাদের ছিল নগদ কড়ি তারা হয়েছে মালিক।

আমার বাবা নিতাই মুনডা ঠাকুরদার চোদ্দ বিঘা জমিতে ভাগচাষ করত। তাতেই আমাদের কোন রকমে চলে যেত। সে সময় আমাদের মত গরীব সহজ-সরল মানুষদের প্রয়োজনও তো ছিল কম। দুবেলা পেট ভর্তি খেতে পেলে আর অবসর সময়ে মাদল বাজিয়ে নাচতে পারলে মুনডাদের অন্য কিছুর দরকার হত না।

সুধীর মুনডা থামল। ঢক্ ঢক্ করে এক ভাঁড় জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে আবার বলল, বাবা খুব তেজী লোক ছিল। তার শক্ত সমর্থ দেহটা যেমন ছিল কঠিন পরিশ্রমের উপযোগী তেমনি ছিল মনের জোর। একবার হল নেকড়ের উপদ্রব। বাবা দুটো বর্শার মাথায় মশাল জ্বেলে সারারাত একাই নেকড়ে তাড়িয়ে বেড়াত। সে সব কথা শুনে কি হবে।

আমরা ছিলাম পাঁচ নম্বর লাটে।

কিসের যেন ঢেউ এল দেশে। ভাগচাষীরা বলল, আমাদের দু' ভাগ মালিকের এক ভাগ। লোকে বলল, তেভাগা আন্দোলন। বাবা হল আন্দোলনের ছোটখাট নেতা। তেভাগা নিয়ে জমিদার জোতদার আর ভাগচাষীদের লড়াই। বড়লোকের ভাড়াটে গুণ্ডা আর লাঠিয়াল ধান কাটতে থাকে। বাবাও তার দলবল নিয়ে বাধা দেয়। লড়াই জমেছিল ভাল কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না আমার বাবা।

আমি তখন সোনাটিকুরি পাঠশালায় পড়তাম।

পণ্ডিতমশায় বলতেন, দেশ স্বাধীন হয়েছে। আর আমাদের দুঃখ কষ্ট থাকবে না।

আমার মত ছোট ছোট ছেলেরা হাঁ-করে পণ্ডিত মশায়ের কথা শুনতাম। স্বাধীনতার অর্থই বুঝতাম না। আমার সহপাঠীরা সবাই ছিল সম্পন্ন গেরস্থ ঘরের ছেলে। আমিই একমাত্র আদিবাসী। চেহারা ও বেশভূষায় ওদের থেকে

আলাদা। আমাকে পাঠশালায় বসতে হত মাটির মেঝেতে। যা দু চারটে বেঞ্চ ছিল তাতে বসত অন্য সব সহপাঠীরা যাদের বাবা মায়ের অবস্থা ছিল মোটামুটি চলনসই।

সেদিন ছিল রবিবার। সামনে স্বাধীনতা দিবস। পণ্ডিতমশায় বিকৃত সুরে "জাতীয় সঙ্গীত" শেখাতেন। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমরা গান গাইব। আগেই বলেছি, স্বাধীনতার অর্থ আমরা বুঝতাম না। তবে সেদিনটা ছুটির দিন। আমরা হৈ হুল্লোর করতে পারব। এটাই আমাদের লাভ।

সেই রবিবারে প্রথম বুঝলাম 'স্বাধীনতা' বস্তুটি কি এবং কেমন?

আমি উঠোনে বসে গরুর জাব কাটছিলাম। বাবা খড়ের চালে নতুন খড় চাপাতে ব্যস্ত। এমন সময় স্বাধীনতার অগ্রদূত একদল পুলিশ হাজির হল আমাদের বাড়িতে। বাবাকে বাইরে ডেকে নিয়ে কি যেন বলাবলি করে পুলিশ বাবাকে দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে গেল।

পরে শুনেছিলাম, বাবাকে আদালতে হাজির করেছে ডাকাতি ও খুনের দায়ে।

তোমরা বিশ্বাস কর আর নাই কর, আমার বাবার মত সৎলোক এই তল্লাটে খুব কমই ছিল। আমার বাবা ডাকাতি করতে পারে অথবা খুন করতে পারে এটা কেউ-ই বিশ্বাস করত না। তবুও এই অপরাধে বাবার মেয়াদ হল ছয় বছর।

আমার বয়স বার তের। সংসারে মা, আর বড় দিদির বয়স পনর-ষোল। তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল ছয় নম্বর সোনাটিকুরি গাঁয়ের নিমু সরদারের ছেলে অমূল্যের সঙ্গে। এমন সময় বাবাকে গ্রেপ্তার করায় সব ভেস্তে গেল। বাবার মামলা পরিচালনা করতে আমাদের নিজস্ব ছ' বিঘে জমিও বিক্রি হয়ে গেল। ভাগচাষও বন্ধ। আমরা পড়লাম অকূল সাগরে।

বাবার মেয়াদ হবার সংবাদ পেয়েই মা শয্যা নিল। মরার সময় বলে গেল, জমিদার আর জোতদারদের মিথ্যা চক্রান্তে বাবা ফেঁসে গেছে। যদি পারিস এর শোধ নিস।

মা বেশি কথা বলত না। অল্প কথা দিয়ে শেষের আশীর্বাদ শেষ করে মা মারা গেল।

দিদির বয়স আরও বেড়েছে।

আমিও পনর বছরে পা দিয়েছি। ধান রুইতে, ধান কাটতে যাই। দিদিও বাড়ি বাড়ি পাট দেয়। কোন দিন খাই কোন দিন খাই না, তবুও দিন কাটে

রাত হয়, রাত কাটে দিন হয়। আমাদেরও দিন কাটে। কিন্তু অসহ্য সেই জীবন।

দিদি বলল, চল কলকাতায় যাই।

সেখানে কি করবি?

খেটে খাব। যেখানেই হোক খেটে খেতে হবে। তুই বড় হয়েছিস, তুই মোট বইবি, আর আমি, আমি, তাইতো, কি করব তা বলতে পারছি না। একটা কিছু করবই ঠিক।

আমরা স্থির করেছিলাম কলকাতায় পাড়ি জমাবার। শেষ পর্যন্ত কলকাতায় যাওয়া হল না।

বাবা জেলে পচছে, মা মারা গেছে, ঘরে খাবার নেই, দিন মজুরী জোটে না, এমন একটা সময়ে রাতেরবেলায় হামলা হল আমাদের ঘরে। আমার চোখের সামনে দিদিকে টানতে টানতে নিয়ে গেল পশুরা, আমার চোখের সামনে আমাদের বাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল। কারা জানো? ওরা সেই জমিদার-জোতদারদের পেয়াদা বরকন্দাজ গুণ্ডারা। পৈতৃক বাস্তু থেকে আমরা চিরকালের জন্য বঞ্চিত হলাম।

তারপর?

তারপর আরও পাঁচ বছর কেটে গেছে। দিদির কোন খবর আর জানি না। কেউ বলেওনি দিদি কোথায় গেছে। অনেকের মুখে শুনেছি, নৌকায় করে দিদিকে নিয়ে গেছে অনেক দূরে বিদ্যাধরী মাতলা পেরিয়ে সুন্দরবনের গহীন জঙ্গলে। আমাদের পূর্বপুরুষদের বাঘে কুমীরে খেয়েছে, তাদের জন্য কেউ-ই আহা উহু করেনি, আর নিতাই মুনডার মেয়ে পাতুরি মুনডা হারিয়ে গেলে কেউ কি আহা-উহু করে!

আমি আশ্রয় পেলাম সোনাটিকুরির ছয় নম্বর লাটে নিমু সরদারের ঘরে।

চাষার ছেলে চাষার বাড়িতে খেটে খাই। সকালবেলায় পেটভর্তি পান্তা পেলে আর কিছুরই দরকার হত না। দুপুরবেলায় সব দিন গরম ভাত না জুটলেও রাতেরবেলায় পেটভর্তি ভাত পেতাম।

নিমু সরদারও ভাগচাষী। তবে তার ছিল ধানের ব্যবসা। নিমু সরদার ধান কিনে আনত হাট থেকে। সেই ধান সেদ্ধ করে ধান ভানত। ভানা ধান ঝেড়ে ঝুড়ে চাল তৈরি করে নিয়ে যেত নদীর ওপারের হাটে। রোজই এক মণ-

সোয়ামণের চালের বস্তা মাথায় করে যেতাম নদীর ওপারে। নানা বারে নানা জায়গায় হাট বসত, সেই সব হাটে যেতে হত।

এমনি করেই চার-পাঁচটা বছর কেটে গেল।

একদিন বিকেলবেলায় বাবা ফিরে এল। প্রথমে তো তাকে চিনতেই পারিনি। মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ, ময়লা ছেঁড়া একখানা ধুতি পরনে। দেহটা আমার আজকের দেহের মতই শীর্ণ। নিমু সরদারের বাড়িতে এসে আমার খোঁজ করছিল। আমি তখন গরুর জাব কাটছিলাম। গলার শব্দটা চেনা চেনা মনে হতেই এগিয়ে গিয়ে বললাম, কাকে চাই? সুধীরকে? আমি সুধীর।

বলা মাত্র হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল নিতাই মুনডা। ছুটে এসে আমাকে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে বলল, আমি তোর বাবা নিতাই মুনডা। কাল খালাস পেয়েছি।

আরও কত কি যে বলেছিল তা স্মরণ করতে পারছি না।

আমিও খুব কেঁদেছিলাম। কিন্তু কিছুই বলতে পারি নি। সে দিনটার কথা কোন দিন ভুলতে পারব না।

সবার খাওয়া শেষ হয়েছে।

অন্ধকার ঘরে হাত শুকিয়ে বসে বসে সুধীর মুনডার কাহিনী শুনতে শুনতে কেমন বেমনা হয়ে পড়েছিলাম।

সুধীরের কণ্ঠস্বর প্রায় রুদ্ধ।

আবেগ প্রবল। বলার ভাষা কিছু নেই। শুধু দীর্ঘশ্বাস। অন্ধকার ঘরে সুধীর মুনডার ফোঁসফোসানি বিনা আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।

ভারতী সবার আগে উঠে দাওয়াতে মুখ ধুতে গেল। আমরাও পেছন পেছন বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। সুধীর মুনডা দাওয়াতে খড় বিছিয়ে দিল। আমরা খড়ের উপর চাদর বিছিয়ে আরাম করে বসলাম।

ভারতী পুরাতন প্রসঙ্গ আবার উত্থাপন করে বলল, তোমার বাবা ফিরে আসার পর কি হয়েছিল?

তাকে সাহায্য করেছিল নিমু সরদার।

যাদের জমি বাবা ভাগ চাষ করত তারা জমি খাস করেছিল, নতুন ভাগচাষীকে জমি দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। তে-ভাগার হাত থেকে, তো তারা বাঁচতে পেরেছে।

কিন্তু ভগবান বিরূপ। বাবা সাড়ে চার বছর পর দেশে ফিরতেই পুরাতন

বন্ধুবান্ধবরা আবার এল। আবার তারা টানতে থাকে বাবাকে ' আবার আন্দোলন করার জন্য সমবেত হতে থাকে। প্রথম কয়েক মাস বাবা চুপ করেই বসেছিল। অনেক লোক এসেছে ও বলাবলি করেছে। বাবা চুপ করে থাকতে পারে নি। আবার পুরোনো দিনের বাঘের মত তেজে জেগে উঠল। আবার বাবা মেতে উঠল তেভাগা আন্দোলনে। তার গরীব সঙ্গী-সাথীরা এই চারকাঠা জমি দিয়ে এখানে বসবাস করার ব্যবস্থা করেছিল, তাদের পরিশ্রম ও চেষ্টায় এই ঘরখানাও তৈরি হয়েছিল। বাবা আর চাষের কাজে যেত না। দিন রাত গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত। গরীব চাষীদের ঘরে কোন দিন দু মুঠো জুটত কোন দিন জুটত না। সে দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করত না। তার গলার শব্দ পেলে চাষীরা ভিড় জমাতো। তারা দল বেঁধে যেত জোতদার-জমিদারদের বাড়িতে। চিৎকার করে দাবী জানাত। বাবা ছিল তাদের নেতা। মাঝে মাঝে বাবা ফিরে আসত। ঘরে এসেও বিশ্রাম পেত না। দল বেঁধে লোক আসত অভাব অভিযোগ জানাতে।

এমনি করে আরও দুটো বছর কেটে গেল।

স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার আইন জারী করেছে। হিড়িক পড়েছে জমি বেনামের। জোতদার-জমিদাররা তাদের জমি বাড়ির কুকুর-বেড়ালের নামেও বেনামী করতে ব্যস্ত। উদ্বৃত্ত জমি সরকারের ভেষ্ট হবে। সেই ভেষ্ট জমি ভূমিহীনদের দেওয়া হবে। এই সব শুভ সংবাদ শুনে অনেকেই উৎফুল্ল হলেও কাজের সময় দেখা গেল ভূমিহীনদের ভাগ্যে এক ইঞ্চি জমিও জোটেনি।

বাবা এসব লক্ষ্য করছিল। ভূমিহীন ভাগচাষীদের সঙ্গে করে গ্রামে গ্রামে বেনামী জমির তালিকা তৈরি করছিল। সরকারের কাছে দরখাস্ত করছিল। আমিই সে সব দরখাস্ত লিখে দিতাম। আদিবাসী সমাজে লেখাপড়া জানা লোকের তো খুবই অভাব। নস্করদের কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল, তিওর-ক্যাওট সমাজের লোকেদের অনেকেই এসেছিল তবে তারা মুনডা সরদারের সরদারী সহ্য করতে পারত না।

আমি নিমু সরদারের সঙ্গে ভাগে চাষ করি। সারা বছরের ধান উঠাতে চেষ্টা করি। দুটো পেট চলে যাবার মত ধান যে না পেতাম তা নয় তবে ধান বেচে অন্য খরচ চালাতে হত মাঝে মাঝে।

সোনাটিকুরি ছ' নম্বরে আমিন এসেছিল জমি মাপতে। ভিড় জমিয়ে

ছিল জোতদাররা। বাবা তার দলবল নিয়ে আবেদন ও প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিল।

নিষ্ফল আবেদন ও প্রতিবাদ জানিয়ে ফিরতি পথ ধরে যখন আসছিল, তখন রাত এক প্রহর পেরিয়ে গেছে। বাবার হাতে লাঠি, সঙ্গী সৈফুদ্দির হাতেও লাঠি। দুজনে গল্প করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছিল। নয়নসুকের মধ্যে আবাদের বাঁধের পাশে গভীর জঙ্গল। জঙ্গল পেরোবার আগেই পেছন থেকে লাঠির আঘাত পড়ল দুজনের মাথায়। কে মারল কেউ দেখতে পেল না। অন্ধকার রাতে দেখার উপায় ছিল না। কঠিন আঘাতে দুজনেই মাটিতে গড়িয়ে পড়েছিল। দুজনেরই জ্ঞান ছিল না।

পরের দিন সকালবেলায় সৈফুদ্দির অচেতন দেহটা পাওয়া গেল বাঁধের ধারে আর পাওয়া গেল বাবার দেহটা, মাথাটা ধড় থেকে আলাদা করে নিয়ে গেছে দস্যুরা।

চারদিন পর সৈফুদ্দির জ্ঞান হল।

তারই মুখে শুনেছিলাম ঘটনাটা।

বাবার অপমৃত্যু ঘটল, সৈফুদ্দি আজও বেঁচে আছে অক্ষম দেহ নিয়ে। আজও তার কাছে গেলে শুনতে পাবেন সেই ভয়ঙ্কর রাতের কাহিনী।

অনেকটা রাত হয়েছে।

অন্ধকার রাতটা কেমন যেন থম থমে হয়েছে। আমরা নীরবে শুনছিলাম মুনডার কথা। কথা শেষ করে থামতেই বললাম, কে বা কারা এই গুরুতর অন্যায় করেছিল তা কি তুমি জানো?

জানি কিন্তু প্রমাণ নেই। থানায় খুনের রিপোর্ট হয়েছিল। সৈফুদ্দি একজনকে আবছা চিনতে পেরেছিল। নামটাও বলেছিল। সেই জল্লাদটা আজও বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কে সেই লোকটা?

তোমরা তো তাকে চেন না। আমি চিনি। এক সময় নটবর পুরকাইত ছিল বাবার অকৃত্রিম সঙ্গী। কেউ কোন সময় বিশ্বাস করতে পারবে না এমন একজন সঙ্গীর হাতে তার প্রাণটা যাবে। জোতদার বদন ঠাকুরের টাকা খেয়ে নটবর তার দলবল নিয়ে ওঁত পেতে বসেছিল ঝোপের ভেতর।

তামাসা কোথায় জানো বাবু! তিন-চারদিন নটবরের দেখা কেউ পায় নি। তিন-চারদিন পর হঠাৎ এসে হাজির হল আমাদের বাড়িতে। বলল, গিয়েছিলাম

হিঙ্গলগঞ্জে। ফিরে এসে শুনলাম নেতাইদা খুন হয়েছে। এমন সর্বনেশে ব্যাপার যে ঘটতে পারে তা অনেক বার বলেছিলাম নেতাইদাকে। সাবধান হয়ে চলাফেরা করতে। আমি থাকলে এক হাত হয়ে যেত।

বললাম, নটুকাকা, তুমি তো সেদিনকার জমায়েতে ছিলে।

নটবর হকচকিয়ে গেল। বলল, ছিলাম তবে আগেই আমি চলে গিয়েছিলাম। সেই রাতেই যেতে হয়েছিল, ভগ্নীপোতের ব্যামো, চুপ করে থাকতে পারিনি। সেদিন তো আমাদের এক সাথেই ফেরার কথা ছিল। নেতাইদাকে বলে কয়েই আমি হিঙ্গলগঞ্জে গিয়েছিলাম। তা তো হল, এখন কাজ কম্মটা তো করতে হবে, তার কি করছিস?

আমার মনে তখন ঝড় বইছে। লাশকাটা ঘর থেকে বাবার ধরটা এনে পুড়িয়ে এসেছি আগের দিন। একটা পয়সা নেই ঘরে। ভাবছিলাম এক পালি চাল বিক্রি করে কিছু ব্যবস্থা করব। নটবরের কথায় কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। সামনে অন্ধকার ভবিষ্যত, কোন কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না।

নটবর আবার বলল, কিছু ঠিক করেছিস সুধীর?

কিছুই ঠিক করিনি নটুকাকা। তবে করার কিছু নেই। আমাদের জ্ঞাতি-গোত্র যা বলবে তা করতে হলে অনেক টাকার দরকার। তুমি তো জানো না মুনডাদের সমাজবিধি, ওসব মেনে চলা খুবই কঠিন, তারচেয়ে কিছুই করব না।

নটবর ইতস্তত করে বলল, তোর টাকার দরকার হলে আমি দেব।

শুধবো কি করে?

তোর তো এখনও বার চোদ্দ কাঠা জমি আছে। সেটাই রেহান থাকবে। যখন পারবি তখন শুধবি, সুদ দিতে হবে না।

ভেবে দেখব কাকা। এখনও মন ঠিক করতে পারিনি। মুখের দানা বেচে দিয়ে বাবার কাজ করা উচিত হবে কিনা ভেবে দেখব।

নটবর ফিরে গিয়েছিল।

বাবার কোন কাজকম্ম করতে পারিনি বাবু। করেই বা কি হবে।

বাবা বলত, এই জন্মই শেষ। আগেও ছিল না, পরেও নেই। বাবার কথা তো মিথ্যে নয়। যার পরে কিছু নেই তার জন্য কোমর বেঁধে জমি রেহান দিয়ে মুখের গ্রাস অন্যের হাতে তুলে দিতে পারিনে।

সুধীরের কথা শুনতে শুনতে ইসুফ ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার নাক ডাকার

শব্দ বেশ শোনা যাচ্ছে। আমি ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে ঘড়ি দেখলাম। রাত তখন দেড়টা।

এবার শুতে যাও সুধীর।

আর কতক্ষণ রাত আছে বাবু?

তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা।

তোমরা শুয়ে পড়। আমার চোখে তো ঘুম নেই। রাত জেগে বসে থাকা আমার কাজ।

ভারতী বিস্মিত কণ্ঠে বলল, কেন?

বাবার মৃত্যুর পরের ঘটনা আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছ মাসী। মা মরল, দিদি হারিয়ে গেল, বাবা মরল। এতেই শেষ হলে হয়ত চোখে ঘুম থাকত। কিন্তু এতেই শেষ হয়নি। আরও দুঃখ আমার জন্য জমা ছিল। জমায়েত দুঃখগুলো লাইন দিয়ে একের পর এক এসে হামলা করতে থাকে, আমিও কেমন যেন হয়ে যাই। দেহ আর মন দুটোই তখন লড়াই করছে শুধু বাঁচার জন্য।

সুধীর থেমে গেল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, বাবা মারা যাবার ক'মাস পরে দিদি ফিরে এল। হাঁ, আমারই দিদি পিতুরি মুনডা। প্রথমে চিনতে পারিনি। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। দিদি হারিয়ে যাবার সময় যে দেহ ছিল তার চোদ্দ আনাই তখন শুকিয়ে গিয়েছে। গাঁয়ের অনেক লোকই বলত, ছুঁড়িটা পেট ভরে খেতে পায় না অথচ কি টস্‌টসে চেহারা। সেই দিদিকে আর পেলাম না। আমার সেই দিদি হারিয়ে গেছে। কেন?

আজও সেই কথা ভাবছি। দিদিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল যোগেশগঞ্জের জঙ্গলে। নিয়ে গিয়েছিল বদন ঠাকুরের গুণ্ডার দল। সে দিন থেকে তার উপর ধর্ষণ চলেছে অবিরাম ভাবে। দিদি পালাবার পথ খুঁজেছে কিন্তু পালাতে পারেনি। পাঁচ সাতজন গুণ্ডা যদি প্রতিদিন অত্যাচার করে তা হলে মানুষ বাঁচতে পারে কি? তবুও দিদি বেঁচে ছিল। আদিবাসীদের প্রাণ তো কচ্ছপের প্রাণ, খেতে না পেয়ে হাড় জিরজিরে হয়েও তারা ধুকতে ধুকতে বেঁচে থাকে। দিদিও বেঁচে ছিল। অবশেষে তার গর্ভে এল সন্তান। কার যে সন্তান তা দিদিও জানত না। দিদি আশায় বুক বেঁধেছে, সন্তানের মুখ দেখার আশায় লড়াই করেছে। অবশেষে সে আশাও তার পূর্ণ হয়নি। ঘোঁতনা কেরেস্তান হল বদন

ঠাকুরের ডান হাত। পেটে সন্তান নিয়ে ঘোঁতনার সঙ্গে যুঝে উঠতে পারবে কেন? ঘোঁতনার মেজাজ চড়া, একদিন কসে লাথি মারল দিদির পেটে। গর্ভপাত ঘটল। দিদিরও বাঁচার আশা ছিল না। কিছুটা শরীর ভাল হতেই দিদি লুকিয়ে বেরিয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করতে করতে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু দিদি বাঁচেনি বেশি দিন। মরার আগে খুঁটিয়ে বলে গেছে তার দুর্ভাগ্যের ঘটনা। আর বলে গেছে, জানিস সুধীর যাদের আছে তারা আরও চায়। যাদের নেই তারা আরও হাহাকারে ডুবে মরে। এই অবস্থাকে আর মেনে নিস না। গরীবের কিছু নেই, আছে বাঁচার তাগিদ। সেই বাঁচাটা যেন মানুষের মত বাঁচা হয়।

সুধীর থেমে গেল।

কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাত্রি। আকাশ ভর্তি নক্ষত্র। নক্ষত্রের মিটমিটে আলোর কোলে আবছা আলো নিয়ে শেষ রাত্রির একফালি চাঁদ তখন উঁকি দিচ্ছে। দূরের গাছপালাগুলো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। গাছগুলোর কালো কালো মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে। দূরত্ব যে কত তা অনুমান করাও সম্ভব নয়। ভারতী গা এলিয়ে দিয়েছিল আমার পাশে। তারও নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। মৃদু আলো এসে পড়েছে তার মুখের ওপর। সেই আলোতে ভাবনা-চিন্তা হীন তার মুখের চেহারাটায় কোমল কোমল ছাপ।

শোনা গেল সুধীরের দীর্ঘশ্বাস।

তুমিও শুয়ে পড় বাবু।

দরকার নেই। আর ঘণ্টা দেড়েক রাত বাকি। তোমার সঙ্গে কথা বলেই কাটিয়ে দেব। সুধীর, তোমার ছেলে-মেয়ে নেই?

আমি তো বিয়েই করিনি বাবু।

কেন?

সময় পাইনি। গরীবদের জীবনে ঝড়-ঝাপটার অভাব তো থাকে না সে সব ঝড়-ঝাপটা আসে পেটের ভাত রোজগার করতে। আমার জীবনে উপরি পাওনা ছিল অনেক। ঝড়-ঝাপটার দু চারটে ঘটনা তো বললাম। আরও কঠিন ঝড়-ঝাপটার মাঝে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে বিয়ে করার কথা ভুলেই গিয়েছি। জানো বাবু, যারা নিজের কথা ভাবে তারা সুখে থাকে। যারা অন্যের কথা ভাবে তাদের দুঃখের অবধি থাকে না। আমার বাবা আমাকে অন্যের কথা ভাবতে শিখিয়ে গেছে, তাই দুঃখ আমার নিত্য সঙ্গী। এই যে নদী পেরিয়ে এসেছ, পয়সা দিয়েছ কি?

আমরা খেয়া পাইনি। পাটনী আমাদের পার না করেই নৌকা উল্টো ঘাটে রেখে চলে গেছে। ডাকা হাঁকা করেও তার দয়ালাভ করতে পারিনি।

সুধীর বলল, কখনও কখনও এ রকম হয়। গরীব মানুষ হয়ত ঘরে ছেলে মেয়ের অসুখ, নইলে ঘরে চাল নেই, তাই খেয়া বন্ধ করে ওকে ছুটতে হয়েছে ঘরের দিকে। ওদের দোষ নেই। আজও এই বাদার মানুষ নদীনালার এই দেশে নদী পারাপার করছে বিনা পয়সাতে। এটাই গরীব দেশের মানুষের অনেক লাভ। ইংরেজ সরকারের আমলেও এইসব পারঘাটা ছিল বিনা পয়সার পারঘাটা। স্বাধীন সরকারের আমলে হঠাৎ দেখা গেল এই সব নদীর পারঘাটাগুলো নিলামে বিক্রি হয়ে গেছে। গরীব মানুষদের ওপর নতুন করে ট্যাক্স বসল।

যাদের সঙ্গতি আছে তারা প্রতিবাদ করল না। মনে মনে খুশীও হল না কিন্তু তারা প্রতিবাদ জানাতেও সাহস পেল না। ওদের সরকার। সরকারের কাজে প্রতিবাদ জানানো ওদের কাজ নয়। গরীব মানুষ যারা কলাটা মুলোটা নিয়ে হাটে যেত তাদের পক্ষে এই পারঘাটার পয়সা হয়ে দাঁড়ালো ট্যাক্স।

আমরা যারা গরীব মানুষ তারা সভা করলাম। প্রতিবাদ জানালাম। আবেদন নিবেদন করলাম। বৃথাই গেল আমাদের আবেদন নিবেদন ও প্রতিবাদ। আমাদের আবেদন নিবেদন শোনার অবসর নেই সরকারের। গেলাম স্থানীয় বিধানসভার সদস্যের কাছে। সেও নির্বিকার। কোন পথ না পেয়ে আমরা ঘেরাও করলাম পারঘাটাগুলো, নদী পেরিয়ে পয়সা দেওয়া বন্ধ করে দিলাম। আমরা পয়সা দেব না, আমরা চিরাচরিত নিয়মমত বিনামূল্যে নদী পারাপার করব।

এবার সরকারের টনক নড়ল।

অবশ্য আমাদের আবেদন নিবেদন শোনার জন্য নয়, আমাদের আন্দোলন দমন করতে। পুলিশ এল, বন্দুক এল, গুণ্ডা এল। এরপর যা হয় তাতো কারও অজানা নয়। তবুও পারল না সরকার আন্দোলন দমন করতে। এই আন্দোলনের ফলে আজও নদী পারাপারের পয়সা কাউকে দিতে হয় না। খেয়ার পাটনীর বেতন দেয় পঞ্চায়েত।

এই আন্দোলনে আমাকেও যোগ দিতে হয়েছিল। আমার বাবা নিতাই মুনডা প্রাণ দিয়েছিল তে-ভাগা আন্দোলন করতে। তার বেটা সুধীর মুনডা পারঘাটা

আন্দোলনে জেল খাটবে, এতো নতুন কিছু নয়। তবে সরকার পারঘাটার পয়সা আদায় না করলেও আমাদের কিন্তু রেহাই দেয় নি। পুরো তিনটে মাস ঘানি টানিয়ে তবেই খালাস দিয়েছিল। উদ্দেশ্য হল, আন্দোলনকারীরা যাতে অন্য কোন আন্দোলনে ভবিষ্যতে যোগ না দেয়। যারা মনে করে তারা দেশ-সমাজ থেকে মোটেই বিচ্ছিন্ন নয় তারা কোন সময়ই অন্যায় দেখলে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। অন্যায়ের প্রতিবাদ তারা করবেই, জেল-জুলুম তাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গতে পারে না।

ইতিহাস আছে সব কিছুর পেছনে। সব ইতিহাস তো লেখা হয় না। বিশেষ করে গরীব মানুষদের ইতিহাস কোন দেশেই লেখা হয়নি। আমরা তো পড়েছি রাজা-বাদশার ইতিহাস। ওরা এমন শ্রেণীর লোক যাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের নাড়ীর কোন সংযোগই নেই। গরীবের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে ধনীর ব্যাপক অত্যাচারকে আমাদের দেশে মহত্বের ইতিহাস বলেই প্রচার করা হয়। পারঘাটার এই ইতিহাস তো দেশের ইতিহাসে লেখা হবে না অথচ গরীব মানুষ এর জন্য বহু নির্যাতন সহ্য করেছে। আবার যারা সে সময় আমাদের আন্দোলনে বাধা দিয়েছে তারাই বুক ফুলিয়ে বলে থাকে, এই মহৎ কাজটা তারাই করেছে।

আমাদের বাঁচতে হয় লড়াই করে। পেটের জন্য লড়াই শেষ কথা নয়, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য লড়াই হল শেষ কথা। ধনী জোতদার-জমিদারদের দুর্নীতি অত্যাচার অবিচারকে টিকিয়ে রাখতে সরকার ও পুলিশ যেমন উৎসাহ বোধ করে তার চার আনা উৎসাহ যদি তারা দেখাত গরীবদের বাঁচিয়ে রাখার পথ খুঁজে দিতে তা হলে গরীবরা সত্যই বাঁচত। পুবের আকাশ লাল হয়েছে, সকাল হতে আর বিলম্ব নেই। এ সব দুঃখের কাহিনী শুনতে হলে বহু বিনিদ্র রজনী পেরিয়ে যাবে তবুও শেষ হবে না। তুমি ঘুমিয়ে নাও বাবু।

ভারতী পাশ ফিরে শুলো। ইসুফ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমার চোখেও ঝিমুনি। সুধীরের কথা শেষ হতেই দেহে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ভাল করে বসলাম। চারদিকে তাকিয়ে বললাম, আজ আর ঘুম হবে না। সকাল হয়েছে, এবার গন্তব্যস্থলের দিকে এগোতে চাই। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি আর দিতে চাই না।

সুধীর কুণ্ঠিতভাবে বলল, আমার কিছুই নেই। দিতেও পারিনি কিছু। কষ্ট

আমাদের নেই। আমাদের শরীরের অনুভব শক্তি যেন ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে। আমরা না খেয়ে মরি কিন্তু অনাহারকে অভিশাপ দিই না। এক সময় আমরা ছিলাম জমির মালিক, এখন আমরা হয়েছি ভিখারী। আমরা ভিক্ষাবৃত্তিকে নিন্দা করি না, যারা আমাদের ভিখারী করেছে তাদের আমরা ঘৃণা করি।

ভারতীকে ডেকে তুললাম। ইসুফও উঠল। চাদর গুটিয়ে থলে কাঁধে করে আমরা পথে নেমে পড়লাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মাইলটেক পথ এগিয়ে এসে সুধীর মুনডা বিদায় নিল।

যাবার সময় বলল, এ পথে এলে পায়ের ধুলো দেবেন।

স্মিতহাস্যে বিদায় নিয়ে আমরা লোনা জলের বাঁধ ধরে চলতে থাকি।

সেই তালগাছের কাছে এসে ইসুফ বলল, সুধীর মুনডার সব কথা শুনেছেন দাদা?

সব শোনা তো সম্ভব নয়। সারারাতে যতটুকু শোনা যায় তা শুনেছি।

ভারতী বিস্মিতভাবে বলল, তুমি রাতে ঘুমোওনি। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সুধীর মুনডা আমাদের চোখের ঘুম কেড়ে ক্ষান্ত হয়নি, আমাদের মনের জগতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছে। কেমন একটা প্রবল ঝড়, বলতে পার কেমন একটা টাইফুন। আমার মনটা যেন মুচড়ে মুচড়ে উঠছে।

ভারতী মুখ ফিরিয়ে দেখল। পরক্ষণেই গম্ভীরভাবে বলল, ইমোশ্যন মোটেই ভাল নয়। তোমার ভাবগতিক ভাল মনে হচ্ছে না। আমাদের এই অভিযানকে তিক্ত করতে চাও বুঝি?

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, তুমি যেন মানুষকে বাদ দিয়ে অভিযানের আনন্দ উপভোগ করতে বিশেষ আগ্রহী। কলকাতার কাছের মানুষ এরা অথচ এরা মানুষের রাজ্য থেকে যেন নির্বাসিত। প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের অথবা মধ্য-যুগের সভ্যতার দাসত্ব করছে এখানকার মানুষ। এখন এদের মাঝে চেতনা জেগেছে। যারা এদের মানুষের অধিকার থেকে এতকাল বঞ্চিত রেখেছিল তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে নব চেতনাকে রূঢ় কঠিন আঘাত করতে কায়েমী স্বার্থের মানুষরা আঘাতের পর আঘাত করেছে। আঘাত সহ্য করে আজও যারা বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সুধীর মুনডা তাদের একজন। এই মানুষগুলোর সঙ্গে কায়েমী স্বার্থের মানুষদের লড়াই চলেছে ভেতরে ও বাইরে।

ভারতী বাধা দিয়ে বলল, অমানুষ চিরকাল মানুষকে আঘাত করে।

এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেখানে নিপীড়িত এই মানুষের দল মানুষের মর্যাদা নিয়ে, শ্রদ্ধার আসন নিয়ে বাস করতে পারে।

ইসুফ বলল, সহজে তা হবে না দাদা। অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তবেই আমরা সেই সমাজ ব্যবস্থায় পৌঁছতে পারব। সুদীর্ঘকালের সাধনা, নিষ্ঠা ও ত্যাগের মাঝ দিয়েই সেই সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। আমরা সেই দিনে হয়ত পৌঁছতে পারব না। মানুষের তো মৃত্যু নেই, উত্তরকালের মানুষদের জন্যই ধীরে হোক আর দ্রুত হোক সেই সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

ভারতী আর প্রতিবাদ করেনি। আমিও বাক্যব্যয় না করে সুশীল নস্করের বাড়ির খোঁজে ক্রমে ক্রমে এগোতে থাকি।

নয়নসুক গ্রামের নাম। উত্তরে-দক্ষিণে, পূর্বে-পশ্চিমে ছয় মাইল নয়নসুক। গ্রাম বললে যা বুঝায় তা যেন নয়। বাঁধের ধারে ধারে একটা লাইনে ফাঁকায় দু চারটে খড়ের চালা। আশে পাশে কোন বসতি নেই। একটা বস্তি বাদ দিয়ে পাঁচশ গজ না চললে দ্বিতীয় বস্তিটি পাওয়া যায় না। অথচ একটি গ্রাম। সাকুল্যে বিশ পঁচিশ ঘর বাসিন্দা নিয়ে একটা নম্বরী লাট। গোটা লাটে খুব বেশি হলে দুশ ঘর বাসিন্দা। জনসংখ্যাও সেই অনুপাতে খুবই সামান্য। গাছপালা বলতে বিশেষ কিছু নেই। কোথাও কোথাও খেজুর গাছের বন, কোথাও বা দুটো একটা বটগাছ, নারকেল গাছ, তালগাছ মাঝে মাঝে দেখা যায়। আম-কাঁঠালের গাছ বিরল। দেখতে দেখতে চলেছি। চলছি তো চলছি। যাকেই জিজ্ঞেস করি সুশীল নস্করের বাড়ি কোথায় ; সে-ই উত্তর দেয়, এগিয়ে যাও। আমরাও এগিয়ে চলেছি।

শেষ পর্যন্ত সুশীল নস্করের বাড়ি যখন আবিষ্কার করলাম তখন বেলা বারটা বাজতে আর বিশেষ বিলম্ব নেই। খড়ের দুখানা ঘর নিয়ে সুশীল নস্করের বাড়ি। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাক দিতে একজন নগ্নদেহী বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে বলল, কোথা থেকে আসছেন?

বললাম, কলকাতা থেকে।

সুশীল ঘাটে গেছে। বসুন দাওয়াতে। বলেই হোগলার চাটাই পেতে দিল। আমাদের বিলম্ব করতে হয়নি।

সুশীল এসেই বলল, গতকাল আপনাদের আসার কথা ছিল। অনেক রাত

অবধি সামনের আঙ্গিনায় বসেছিলাম। রাত বারটা বাজতেই মনে হল, আজ আর আসবেন না। শুয়ে পড়েছিলাম।

আমরা হাত-পা মেলে দিয়ে গতদিনের ঘটনাগুলো বললাম। বিশেষ করে বললাম, সুধীর মুনডার কাহিনী। আমাদের কথাগুলো বিশেষ মনোযোগ সহকারে শুনছিল সুশীলের বাবা মঙ্গল নস্কর।

এতক্ষণ কিছুই মঙ্গল নস্কর বলেনি। আমাদের কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলল, নিতাই মুনডা আমার খুব বন্ধু লোক। তে-ভাগা আন্দোলনের সময় এক সঙ্গেই জেলে ছিলাম দুজনে।

বললাম, আপনিও জেলে ছিলেন?

মঙ্গল নস্কর মৃদু হেসে বলল, ছিলাম বললে ভুল হয়। এখনও জেলখানায় আছি।

মানে?

এই তো দু' মাস হল বাড়ি ফিরেছি। ভেতরে গিয়ে দেখুন, ভেতরে আমার তৈরি নতুন দুখানা ঘর কি ভাবে পুড়িয়ে ভেঙ্গে চুরে দিয়েছে জোতদারদের গুণ্ডারা। আমাকে খুন করতে চক্রান্ত হয়েছিল জেনেই আমি সন্ধ্যাবেলায় হুঁ কাহারানিয়াতে পালিয়ে গিয়েছিলাম। ছেলেরাও পালিয়ে বেঁচেছে। আমার স্ত্রী আর ছেলেদের বউরা ছিল। তাদের সামনেই আমার ঘরের সর্বস্ব লুট করে ঘরে আগুন দিয়ে চলে গেছে। এই গুণ্ডাদের বাধা দেবার সামর্থ্য আমাদের থাকলেও পুলিশের বন্দুকের আড়ালে দাঁড়িয়ে পুলিশের সামনে এই কাণ্ড ঘটিয়ে গেছে। নেতাই মরেছে। আমি পালিয়ে বেঁচেছি। তিন বছর পর মাত্র দু' মাস আমি বাড়ি ফিরেছি। রাতের বেলায় এখনও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি না।

খলের ছলের অভাব থাকে কি। বেনামী জমি উদ্ধার করতে নেমেছিলেম, এটাই আমাদের অপরাধ। সুধীর মুনডা শক্ত ছেলে। সে বেঁচে আছে সুদিনের অপেক্ষায়।

সুশীল কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়াল।

কোথায় যাচ্ছ?

অনেক বেলা হয়ে গেছে। রান্না শেষ। আপনাদের স্নানের ব্যবস্থা করি।

সুশীলের পেছন পেছন ভারতী বাড়ির ভেতর গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল তেলের বাটি হাতে করে। এবার স্নান করার পালা। ভারতী কানে কানে

ফিস্ ফিস্ করে বলল, সুশীল জাল নিয়ে পুকুরে খেপ দিচ্ছে। অতিথি সেবার জন্য মাছের ব্যবস্থা করতে নেমেছে।

মঙ্গল নস্কর পোড়খাওয়া মানুষ। তারই মুখে শুনলাম, কেন এইসব গ্রামে ফাঁকা ফাঁকা জায়গায় লোকেরা খড়ের চালা বেঁধে বাস করে।

বাঁধের দিকে প্রবেশ পথ। পেছনে চাষের জমি। আমাদের এই বাড়ির পেছনে রয়েছে চোদ্দ বিঘা জমি। এটাই আমার সর্বস্ব। জমির কোলে আশ্রয় তৈরি করে বাস করছি। এমনি ধারা এই বাদা অঞ্চলের চাষীরা নিজেদের জমির কোলে ঘর বেঁধে বাস করছে প্রায় একশ বছর ধরে। এই কারণেই বাড়িগুলো সব ফাঁকায় ফাঁকায়। ঘন বসতিপূর্ণ গ্রাম বাদা অঞ্চলে বিরল। অবশ্য একশ বছর আগে যারা এইভাবে জমির কোলে ঘর বেঁধেছিল তাদের সবাই আজ অস্তিত্ব রক্ষা করে বাস করতে পারছে না। অনেকের বাড়ি ভেঙ্গে-চুরে গেছে। কোন রকমে মাথা গুজে রয়েছে উত্তরপুরুষরা। যারা ছিল জমির মালিক তাদের শতকরা আশীজনের জমি আজ আর নেই। নিজেদের পৈতৃক জমিতে অনেকে ভাগচাষী, অনেকে অনাহারের জ্বালায় মরেছে, অনেকে পেটের দায়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। শতকরা উনিশজন লোক এখনও আছে যাদের জমির পরিমাণ আমার মত বার-চোদ্দ বিঘা। আর শতকরা একজনের হাতে রয়েছে হাজার হাজার বিঘা জমি, কোথাও স্বনামে, কোথাও বেনামে।

ওরাই বা জমির মালিকানা হারাল কেন?

অতি সহজ কথা। ইংরেজ সরকার আবাদ করতে যাদের এনেছিল তারা আবাদী জমির মালিক হবে এটাই ছিল ঘোষণা। দেখা গেল, আবাদ গড়ে উঠতেই তার মালিক হল লাটদার-জমিদাররা। সরকার চাষীর সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত না করে শোষকদের হাতে জমি তুলে দিল। খাজনা মেটাতে কিছু কিছু জমি বন্ধক পড়ল। সেলামী, নজরানা, তহুরী, মাথট এইসব মেটাতে পারে কি বিশ বিঘা জমির মালিক। তখন জমির খাজনা ছিল আট আনা, একটাকা, আর ধানের দর ছিল বার আনা মণ। এবার হিসাব করে দেখুন। তিন চার মণ ধান বিক্রি করে পেটের খরচ, ঘরের খরচ চালিয়ে খাজনা নজরানা দেওয়া কতটা সম্ভব ছিল সে সময়। এক বিঘা জমি বিক্রি হয়েছে নিম্নপক্ষে দশ টাকায়, উর্ধ্বপক্ষে পঞ্চাশ টাকায়। এক ফসলী জমি, ক্রেতাও তো ছিল না। জলের দামে জমি বিক্রি হত সে সময়।

এটা তো একটা কারণ, অন্য কারণ কি?

এই তো আমার চারটে ছেলে। জমি চোদ্দ বিঘা। তার মধ্যে দশ কাঠা পুকুর আর দশ কাঠা বাস্তু। রইল বাকি তের বিঘা। আমি খেজুর, শুপুরী, নারকেল গাছ দিয়েছি এক বিঘেয়। রইল মাত্র বার বিঘা। আমার মৃত্যুর পর চার ছেলের ভাগে পড়বে তিন বিঘে জমি। তিন বিঘে জমিতে কারও পেট চলতে পারে কি? উপার্জনের অন্য কোন পথ না থাকলে এরা জমি বিক্রি করবে, তারপর একদিন মঙ্গল নস্করের বংশধরদের পাবেন কলকাতার ফুটপাতে। মেয়েরা দিনের বেলায় হয়ত ভিক্ষা করবে, রাতের বেলায় কাপ্তানের সঙ্গে নোংরা কাজ করে নানা ব্যাধিতে ভুগবে। এই ভাবেই বাদার চাষীদের সর্বনাশ হয়েছে। আজ যাদের কলকাতার ফুটপাতে নোংরা পরিবেশে দেখতে পান এদের পূর্বপুরুষ কিন্তু ছিল তেজী বলীয়ান উন্নতমনা। অথচ নিজেদের সন্ততিদের রক্ষা করতে পারে নি। সন্তান সন্ততিরা ভিক্ষা বৃত্তি নিতে বাধ্য হয়েছে।

বললাম, যাদের জমি কম তারা অন্য কোন হাতের কাজ করতে পারে, তা কেন করে না?

হাতের কাজের মধ্যে কুমোর আর ছুতোর। এসব গ্রাম্য জীবনের প্রয়োজন মেটায়। গ্রামের মানুষদের প্রয়োজন কতটুকু। দেখুন তাকিয়ে আমার বাড়িতে দুটো লোহার কড়াই আছে। একটা গুড় জ্বাল দেবার, আরেকটা রান্নার। তৈজসপত্র সবই মাটির। এও তো নেই শতকরা আশীজনের ঘরে। দ্বিতীয়ত বাজার কোথায়? আমরা কলকাতা থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে থাকি। এ অঞ্চলে একটাও রাস্তাঘাট নেই। বর্ষার সময় আমাদের সঙ্গে সভ্য জগতের কোন যোগাযোগ থাকে না। অথচ কয়েকটা সাঁকো তৈরি করে দিলে আর ওপারের বড় রাস্তার সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি করলে আমাদের সামান্য কিছু মাল তো বাজার পেত। পাইকাররা আমাদের ঠকিয়ে নিয়ে যেতে পারত না!

মঙ্গল নস্কর কিছুক্ষণ থেমে বিড়ি ধরাল। বিড়িতে সুখটান দিয়ে বলল, এই ভবিষ্যতকে আমি বুঝতে পেরেছি অনেক কাল আগে। আমি প্রচার করেছি। শুধু তে-ভাগা আন্দোলন আর চোরাই জমি উদ্ধার করতে আন্দোলন করিনি। আমি জনসাধারণের সামগ্রিক মঙ্গল চিন্তা করেই সামাজিক উন্নয়নের অন্য বিষয়গুলোও প্রচার করেছি। আমার ছেলে সুশীলকে বহু কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়েছি। সে প্রাইমারী স্কুল মাস্টারী করছে। তাকে বলেছি, জমির আশা

করিস না। তুই মাস্টারী করবি। চাষ করবি না। মেজটা বেশি লেখাপড়া শেখেনি। সে চালের কারবার করে।

চালের কারবার!

হাঁ। শেষ রাতে চালের বস্তা মাথায় নিয়ে হাটে যায়। চাল বিক্রি করে রোজ দু আড়াই টাকা উপায় করে। সেজ ছেলেকে দিয়েছি নলেনগুড়ের ব্যবসা করতে। ছত্রিশটা খেজুর গাছ লাগিয়েছি। আরও লাগাব। এই গুড়ের ব্যবসা করতে দিয়েছি। বাঁকে করে গুড়ের হাঁড়ি নিয়ে যায় কেষ্টচন্দ্রপুর। সেখান থেকে গুড় যায় জয়নগরে। আপনারা যে জয়নগরের মোয়া খান তা এই বাদা অঞ্চলের নলেন গুড় থেকেই তৈরি। ছোটটাকে দিয়েছি চাষ আবাদ করতে। আমি যা পেরেছি সবাই তা পারে নি, পারবেও না। এই সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ দিশেহারা হয়ে গেছে, কোনটা যে পথ তা ভেবেই পাচ্ছে না।

সুশীল জামা কাপড় পরে প্রস্তুত হয়ে এসে বলল, চারটে বাজতে চলল। আর বসে লাভ নেই। আমাদের সামনে আরও চার মাইল পথ। আপনাদের রাতের বাসস্থান সেখানে স্থির করা হয়েছে।

মঙ্গল নস্কর উৎসাহিতভাবে বলল, হাঁ হাঁ সে-ই কথাই আছে। রাতের বেলায় পথ চলতে কষ্ট হবে। আপনারা শহরের লোক। আজ আপনাদের কষ্ট হল। আমার তো সেবা করার মত সামর্থ্যও নেই।

আমরা প্রস্তুত হয়ে পথে পা দিলাম।

আমাদের সামনে দ্রুতপদে যাচ্ছিল একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি। পরণে তার লুঙ্গি, গায়ে ধোয়া ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে মূল্যবান জুতো, কাঁধে মূল্যবান একটি চাদর। সামনের লোকটি আমাদের কাছ থেকে প্রায় তিরিশ হাত দূরে ছিল। মোটামুটি তাকে ভাল করেই দেখতে পেয়েছি।

সুশীল ফিস্ ফিস্ করে বলল, দেখে রাখুন। লোকটাকে।

আমরা ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালাম।

গ্রামের শেষে রাস্তা দু' ভাগ হয়ে গেছে। ডানদিকের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেল লোকটি। আমরা বাঁদিকের রাস্তা ধরে চলেছি।

সুশীল বলল, এই লোকটি চারটি খুন করেছে। আমাদের সঙ্গে যারা চাষীর দাবী নিয়ে আন্দোলন করত, তাদেরই চারজনকে এই লোকটি খুন করেছে।

লোকটি কি মুসলমান?—জিজ্ঞাসা করল ভারতী।

না, এখানে হিন্দু-মুসলমানের বিশেষ কোন ফারাক নেই। হিন্দু আর

মুসলমান এখানে প্রীতির বন্ধন নিয়ে বসবাস করছে বহুকাল অবধি। মুসলমান সংখ্যায় কম কিন্তু তারা আমাদের কাকা দাদা হয়েই বাস করছে, তারাও আমাদের কাকা-দাদা বলেই মনে করে। লুঙ্গি দেখে সম্প্রদায় ঠিক করা যায় না। মুসলমান যারা অবস্থাপন্ন তাদের অনেকেই ধুতি পরে। আর তো জানেন, এটা হল সুন্দরবন। এখানে বাঘের রাণী বনবিবি, বাঘের দেবতা দক্ষিণরায় আর গাজির রাজ্য। এখানে দক্ষিণরায়ের মন্দিরের পাশেই রয়েছে গাজির মন্দির। যারা সুন্দরবনের গভীরে কাঠ কাটতে যায় অথবা মধু আনতে যায় তারা দুই মন্দিরে সিন্নি দিয়ে তবেই নদীর ওপারে গভীর বনে প্রবেশ করে। হিন্দু-মুসলমানের কোন হাঙ্গামা আজও দেখা দেয় নি। ভবিষ্যতে কি হবে জানি না। আমরা জানি, আমাদের চেয়েও যারা গরীব তারা হিন্দু হোক আর মুসলমান হোক তাদের ক্ষুধার জ্বালা একই প্রকারের।

ভারতী বাধা দিয়ে বলল, ওই লোকটার কথা বলুন।

ওর নাম অর্জুন সরদার। আমাদের সঙ্গী ছিল এক সময়। বাবার সঙ্গে চাষীদের দাবী নিয়ে আন্দোলন করেছে বছরের পর বছর। বামপন্থী আন্দোলনে অর্জুন সরদার ছিল নেতা।

তারপর যখন বেনামী জমি উদ্ধার আরম্ভ হল তখন হাঙ্গামা দেখা দিল। অর্জুনের বাবা দেড়'শ বিঘা জমি বেনামী করে গেছে। অর্জুন তার উত্তরাধিকারী। অর্জুনকে বলা হয় তোমার দেড়শ বিঘা জমি ছেড়ে দিতে হবে। তোমাকেও আইনের সর্ত মানতে হবে।

অর্জুন প্রথমে স্বীকার করতেই চায় না। সে বলল, আমার নামে চুয়ান্ন বিঘা জমি আছে। এটাই আমার সব। বেনামী কোন জমি নেই।

যখন কাগজ-পত্রে তার বেনামী জমির হিসাব দেওয়া হল তখন অর্জুন বলল, ও জমি আমি ছাড়তে পারব না।

বামপন্থী দলের নেতারা বলল, তোমার জমি ছাড়তে হবে, নইলে দল ছাড়তে হবে।

অর্জুন দল ছাড়ল। জমি ছাড়ল না। এখন সে একজন পাকা জোতদার। সে কি জোতের মায়া ছাড়তে পারে।

কিন্তু দল ছাড়ার দিন থেকেই অর্জুন হল বামপন্থীদের উগ্রশত্রু।

সেও দল বাঁধল জোতদারদের সঙ্গে।

সুন্দরবনের বন্যা আর খরা, সুন্দরবনের বাঘ আর লোনা জল। এদের হাত

থেকে কোন ক্রমে আমরা বাঁচতে চাই। সেবার প্রচণ্ড খরা। সেই খরায় চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসল। সরকার রিলিফের জন্য লঙ্গরখানা খুলল হাটতলায়। রিলিফ দেবার অধিকার যারা পায় তারা তো মালিক। অর্জুনের দল রিলিফের মালিক। হাটতলায় লঙ্গরখানা। বামপন্থী দলের লোকেরা মাঝে মাঝে আসে, কাজকর্ম দেখে। অনাচার দেখলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রিপোর্ট করে। এই রিপোর্ট করা হল ওই চারজনের মহাকাল। আপনারা তো জানেন, পুলিশ আর প্রশাসন দুর্জনকে রক্ষা করতে সৃষ্টি করেছে বর্তমান সরকার। আবু, নয়নচাঁদ, আরু আর ভিখু তাদের নামে রিপোর্ট করেছে। কোন বাদ প্রতিবাদ করল না অর্জুনের দল। বি-ডি-ও তদন্ত করে গেল।

তারপর একদিন!

আবু, নয়নচাঁদ, আরু আর ভিখু এল হাটতলায়।

অর্জুন গদ্-গদ্ হয়ে তাদের ডেকে বসাল লঙ্গরখানার পাশের মাচাং-এ।

অর্জুন বলল, তোরা কেন রিপোর্ট করলি? আমাদের দোষ ত্রুটি থাকলে তো বলতে পারতি। আজ না হয় আমি তোদের পার্টি করি না। গত সালেও তো তোদের সঙ্গে কাজ করেছি। এমন ভাবে বেইজ্জত করা কি উচিত হয়েছে।

সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল স্থানীয় স্কুলের দুজন শিক্ষক। তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারাই বলুন মাস্টারমশায়। আমরা দেশের লোক। আমাদের ভুল ত্রুটি থাকলে আমরা ঝগড়া করব, মীমাংসা করব। তা না করে এল বি-ডি-ও। কি লজ্জার কথা। যাক্ যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আপশোষ করি না। তবে এরপর কিছু হলে আমাকে বলবি। আমার চার্জে আছে, আমি সব ঠিক করে নেব।

শিক্ষক দুজনের সঙ্গে অর্জুনের চোখে চোখে কি যেন কথা হল। আগন্তুক চারজন তা লক্ষ্যও করেনি, বুঝতেও পারেনি। ইঙ্গিত বুঝেই শিক্ষক দুজন রওনা দিল।

অর্জুন বলল, ভাল হয়ে তোরা বস। একটু চা খা।

নারে, এই দুপুরে আর চা খাব না।

কি যে বলিস। তোদের রাগ যায়নি দেখছি। ওরে নরু, চারটে গেলাসে করে চা নিয়ে আয়।

আবু আপত্তি করেছিল। তবুও অনুরোধ রক্ষা করতে বাধ্য হল।

এদিকে নরু চা আনতে গেছে আর ফিরছে না।

আবু বলল, থাক তোর চা, আমরা যাচ্ছি। অন্য দিন এসে চা খাব।

এই এসে পড়বে। জল বোধ হয় গরম নেই। যা তো করিম, দেখে আয় তো নরু আসছে না কেন? একটু তোরা বস, আমি গম আর ডাল ওজন করে দিয়ে আসি।

আগন্তুকদের বসিয়ে অর্জুন গেল গম আর ডাল ওজন করতে।

অনেকক্ষণ পরে চারটে কাঁচের গেলাস ভর্তি করে চা নিয়ে এল নরু। চায়ের গেলাসগুলো রেখে নরু কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

বিনা দ্বিধায় আগন্তুক চারজন চা খেল।

চা খেয়ে বিড়ি ধরিয়ে কয়েক পা এগোতে না এগোতেই পেটের যন্ত্রণায় চারজন বিকট চিৎকার করে উঠল। হাটতলায় লোক জমে গেল। কিন্তু অর্জুন, নরু আর শিক্ষক দুজনকে আর দেখা গেল না। পেটের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে চারজন মাটিতে শুয়ে পড়ল। হাটের লোকেরা জল এনে মাথায় ঢালতে আরম্ভ করল, টোটকা ওষুধ খাওয়ালো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। দু' ঘণ্টার মধ্যে চারজন মারা গেল।

ভারতী জিজ্ঞেস করল, কোন ডাক্তার ছিল না?

ডাক্তার? বাদায় ডাক্তার থাকে হেলথ সেণ্টারে। হেলথ সেণ্টার এখান থেকে ষোল মাইল দূরে। মাঝে তিনটে নদী। আর হাতুড়ে দুজন আছে তারাও থাকে ছ-সাত মাইল দূরে। তাদের ডেকে আনার সময় আর ছিল না। আনলেও কিছু হত না।

চারজনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বেশ সরগোল উঠল।

ভারতী বলল, আপনারা কি মনে করেন, এটা বিষ প্রয়োগের ঘটনা।

মনে করাই সব নয় দিদি, পোস্টমর্টেম পরীক্ষায় ওদের পাকস্থলীতে ফলিডল পাওয়া গিয়েছিল। এটা যে স্বেচ্ছাকৃত হত্যা এ বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ নেই।

ইসুফ বলল, আপনারা তখুনি হেলথ সেণ্টারে নিয়ে যেতে পারতেন।

যত সহজে আপনি বললেন, কাজটা তত সহজ নয়। দু' ঘণ্টায় বার মাইল পথ যাওয়া সম্ভব নয়। এখানে রাস্তাঘাট নেই, এমন কি সাইকেল চলার মত রাস্তা নেই। মনে করুন তাকে হেলথ সেণ্টারে নিয়ে গেলাম জীবন্ত অবস্থায়, তাতেও ওদের জীবন্ রক্ষা হত না। গ্রামের হেলথ সেণ্টারে ডাক্তার থাকে কদাচিৎ। যদিও বা ডাক্তার থাকে তাতেও লাভ হয় না। হেলথ সেণ্টারে সব

পাবেন, পাবেন না শুধু ওষুধ। কোন যন্ত্রপাতিও নেই। ডাক্তার ধুয়ে খেলে তো রোগ নিরাময় হয় না দাদা।

তা বটে। তারপর কি হল?

ওদের মরার খবর গেল থানায়? পুলিশ এল পরের দিন। লাশ গেল মর্গে। যথা সময়ে রিপোর্ট পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে মাস্টারমশায় দুজন পালিয়ে গেছে। নরুকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। অর্জুনকে সন্দেহ ক্রমে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মেদিনীপুর থেকে মাস্টারমশাইদের ধরে নিয়ে এল পুলিশ কিন্তু কিছুই হল না। বিষ কোথা থেকে এল তা কেউ প্রমাণ করতে পারল না। ওরা প্রমাণ অভাবে খালাস হয়ে এল। হতভাগ্য আবু, নয়নচাঁদ, আরু আর ভিখু হিংসার বলি হল অহিংস পূজারীদের চক্রান্তে। শাসক দলের প্রভাবে পুলিশও খুনীদের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রমাণ উপস্থিত করতে গাফিলতি করেছিল। এই সেই অর্জুন সরদার। এখন মাথায় মাথা ঠুকলেও কথা বলে না। তবে এই কাহিনীর এটাই শেষ ঘটনা নয়, আরও আছে।

আরও অপকার্য করেছে এই অর্জুন সরদার?

হাঁ। এবারেও প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষে।

খরার শেষ হল।

আকাশে দেখা দিল মেঘ!

চাষীরা উৎফুল্ল হল। ভাগচাষীরা জোতদারদের ঘরে ভীড় জমাল। জমির বন্দোবস্ত নেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

সত্যি সেবার ভাল বৃষ্টি হল। সবার আশা পূরণ করে সোনা ফলল জমিতে।

আমাদের চলার পথের ধারে দেখতে পাবেন একজন জোতদারের বাড়ি। এই গ্রামে এই একটি মাত্র ব্যক্তির দোতলা বাড়ি। চারটি মহল। সামনে বিরাট শানবাঁধানো পুকুর। পুকুরের চারপাশে দেখতে পাবেন শতখানেক বিরাট বিরাট ধানের গাদা। কাগজে-কলমে সত্তর বিঘা জমির মালিক। বছরে এর গোলায় ধান ওঠে সাত থেকে আট হাজার মণ। বেনামে কত যে জমি আছে তার হিসাব জোতদার অসীম হালদার নিজেও জানে না। বাড়িতে দুটো বন্দুক, আটদশ জন লাঠিয়াল যারা ডাকাতির দায়ে তিন চার বছর মেয়াদ খেটে এসেছে। দাস-দাসী অসংখ্য। এই অসীম হালদারের বেনামী জমি যাতে ভেস্ট হয় তার জন্য আমরা সচেষ্ট হলাম। উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মাঝে বন্টনের ব্যবস্থাও করে ছিলাম।

সেবার সোনা ফলল জমিতে।

হাঙ্গামা আরম্ভ হল ধান কাটার সময়। ভাগচাষীদের ঘরে যাতে ধান না ওঠে, ভেস্ট জমির ধান যাতে চাষীরা পায় তার জন্য জোতদাররা দলবদ্ধ হয়ে পুলিশের শরণাপন্ন হল। সরকারের হুকুমে পুলিশ ক্যাম্প বসল অসীম হালদারের বাড়িতে।

এই ক্যাম্পের চার্জে এল শম্ভু মজুমদার। পুলিশ বাহিনীর সুবেদার।

শম্ভু মজুমদার তার দলবল নিয়ে ঘিয়ে দুধে মাংসে পুষ্টিলাভ করছিল অসীম হালদারের বাড়িতে। তাদের খাবার মদ আর মেয়েমানুষ জোগান দিচ্ছিল অর্জুন সরদার। সোনায় সোহাগা বলতে পারেন। স্বার্থ-সম্পন্ন জোতদারদের ভাগচাষীরা যাতে ঘরে ধান তুলতে না পারে তার জন্য উদয়াস্ত শম্ভু মজুমদার পুলিশ নিয়ে বাদার মাঠে ঘুরছিল। গরীব ভাগচাষীদের বন্দুকের কুঁদো পিটিয়ে ধান তুলে দিচ্ছিল জোতদারদের ঘরে। এমন মহৎ কাজের জন্য নগদ কড়িও তাদের লাভ কম হয়নি। যে সব ভাগচাষীর ঘরে পাঁচদশ মণ ধান উঠল তারাও দক্ষিণা দিল শম্ভু মজুমদারকে। মণ প্রতি দশটাকা সেলামী না দিলে ধান আটক হবে। জোতদারের খামারে জমা হবে। তারপর নস্যি হয়ে উড়ে যাবে।

হাঁ, প্রতিবাদ আমরা করেছিলাম। আমরাও আমাদের নায্য হক্ মত ধান ঘরে তুলতে চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের সাহায্য করেছিল বিধানসভার বামপন্থী সভ্য। পঁচিশ-তিরিশ জন চাষী পুলিশের লাঠিতে ঘায়েল হয়েছিল। পুলিশকে সঙ্গে করে গুণ্ডারা ভাগচাষীদের ঘর থেকে ধান লুট করে নিয়ে গিয়েছিল, গ্রেপ্তার করেছিল বহুজনকে। তবুও যখন আমরা সামলাতে পারছিলাম না, যখন পুরুষদের পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছিল, তখন এগিয়ে এল মেয়েরা। তাদের হাতের কাছে ঝাঁটা-বঁটি-দা-লাঠি যা ছিল তাই নিয়ে পুলিশ আর গুণ্ডার মোকাবিলা করতে লাগল।

এই অধ্যায়ের চরম পরিণতি শীগ্‌গীর দেখা দিল।

আমরা শুনতে পেলাম অর্জুন সরদার আর অসীম হালদার ঠিক করেছে বিধানসভার সভ্যকে গ্রেপ্তার করাতে হবে। তারই প্ররোচনায় ভাগচাষীরা তাদের নায্য দাবী নিয়ে হাঙ্গামা করছে। প্রয়োজন হলে তাকে বেমক্কা গুলি করে খতম করে দেবার চক্রান্তও হচ্ছিল।

সংবাদ পৌঁছল বিধানসভার সভ্যের কানে। বিপদ বুঝতে পেরে সন্ধ্যার অন্ধকারে ভদ্রলোক গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে আশ্রয় নিল। সেই রাতেই পঞ্চাশ-

ষাট জন গুণ্ডা পুলিশ ঘেরাও করল বিধানসভার সদস্যের বাড়ি। তাদের লক্ষ্য ব্যক্তিকে না পেয়ে গুণ্ডারা বাড়ি লুট করে সব কিছু নিয়ে গেল। বৃদ্ধ পিতা লক্ষ্মীকান্তকে নানাভাবে অপমানিত করল কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে এই ব্যাপক ব্যবস্থা তাকে না পেয়ে ওরা আরও বেশি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েছিল।

পরদিন হাট বার। হাটতলায় পুলিশ-গুণ্ডার ভীড়। বিধানসভার সদস্যের কাকা-বাবা সবাই গেছে হাটে। হঠাৎ পুলিশ এসে চেপে ধরল তার কাকা বনমালীকে।

কাল কোথায় ছিলিরে শালা?

বনমালী কিছু বুঝতে না পেরে ফিরে তাকাতেই বন্দুকের কুঁদো দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল তার পিঠে। চিৎকার করে বনমালী মাটিতে পড়ে গেল। বনমালীর চিৎকার শুনে বৃদ্ধ লক্ষ্মীকান্ত ছুটে এল। পুলিশকে লক্ষ্য করে বলল, আপনারা পুলিশ, আপনাদের কাজ হল শান্তি রক্ষা করা। আপনারা নিরীহ মানুষ কেন পেটাচ্ছেন।

অর্জুন সরদার পাশে ছিল। পুলিশকে লক্ষ্য করে বলল, এম-এল-এ-র বাবা।

বলা মাত্রই বন্দুকের কুঁদো দিয়ে লক্ষ্মীকান্তের মাথায় আঘাত করল পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেল। সেদিকে নজর দেবার কেউ নেই। পুলিশ তখন বনমালীর পায়ে দড়ি বাঁধতে ব্যস্ত। তাকে পায়ে দড়ি বেঁধে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নিয়ে চলল পুলিশ ক্যাম্পে অর্থাৎ অসীম হালদারের বৈঠকখানায়। হাটের শত শত লোক এই নিষ্ঠুর মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে 'হায় হায়' করে উঠল কিন্তু বন্দুকের সামনে প্রতিবাদ করার সাহস কারও ছিল না। সবাই নির্বাক এবং জড় হয়ে গিয়েছিল।

বনমালীর ছেলে অভিরাম কলেজে পড়ে। সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে তার বাবা আর জ্যাঠার খবর পেয়ে ছুটে গেল পুলিশ ক্যাম্পে। গিয়ে দেখল তার বাবার হাত-পা বাঁধা। মাটিতে শুয়ে রয়েছে। সামনে ছিল শম্ভু মজুমদার। জিজ্ঞেস করল, কি চাই?

আমার বাবাকে খুঁজতে এসেছি।

কে তোর বাবা?

বনমালী গায়েন।

ঐ তো শালা।

গাল দেবেন না। আমার বাবাকে কেন গ্রেপ্তার করেছেন? আমার বাবা ;

আর কথা শেষ হল না। শম্ভু মজুমদার চিৎকার করে সেপাইকে বলল, ওই শালাকেও দড়ি দিয়ে বেঁধে রাম ধোলাই দে।

অভিরাম আর দেরী করল না। তড়াং করে লাফ দিয়ে বাইরে এসে দিল দৌড়। পুলিশ ছুটে এসে অন্ধকারে তাকে খুঁজে পেল না। অভিরাম গ্রাম ছাড়া হল।

এই সব ঘটনায় রয়েছে আমাদের এককালের সহকর্মী অর্জুন সরদার। আপনাদের নিয়ে যাব বনমালী গায়েনের বাড়িতে। তার দেহের অবস্থা দেখবেন। একটা হাত অকর্মণ্য হয়ে গেছে, তার কাছেই শুনবেন নিপীড়নের কথা। আর লক্ষ্মীকান্তবাবু নিজেই বলবেন তার কথা। এই লক্ষ্মীকান্তবাবুই ছিল এখানকার কংগ্রেসের মাতব্বর, গণ্যমান্য ব্যক্তি। দেশের মানুষ বিপদে-আপদে তার দ্বারস্থ হয় আজও। গতদিনের কংগ্রেস মাতব্বর বর্তমান কংগ্রেস সরকারের হাতে কি ভাবে নিগৃহীত হয়েছে তার করুণ কাহিনী শুনতে পাবেন। তার অপরাধ হল তার ছেলে বামপন্থী আন্দোলন করে এবং নেতা হিসাবে দেশের লোক ভোট দিয়ে তাকে বিধানসভায় পাঠিয়েছে।

সুশীল নস্কর থেমে গেল। ডানদিকে হাত বাড়িয়ে বলল, এদিকের মাঠে ধান কম দেখতে পাচ্ছেন।

বললাম, হ্যাঁ। বাঁ দিকে তো প্রচুর ফসল দেখছি। কেন?

ডানদিকে হল হাইকোর্ট। ভাগচাষী বিতাড়নের এও এক আইনগত অভিনব উপায়। ভাগচাষীরা জমিতে হাল দিয়েছে, ধান রুয়েছে, তারপরই মালিক হাজির হয়েছে হাইকোর্ট অথবা অন্য কোন কোর্টের পরোয়ানা নিয়ে। ব্যস্, ভাগচাষীরা আর কি করবে। মাথায় হাত দিয়ে বসেছে! জমির মালিক থাকে কলকাতায়, তারা বিঘেয় যদি দু'মণ ধান তুলতে পারে সেটাই তার লাভ। চাষের জন্য ব্যয় করেনি, বীজ বপন করতে হয়নি, সার দিতে হয়নি, অথচ দু'মণ ধান বিনা ব্যয়ে লাভ করাটাই হল বড় লাভ। ডানদিকের জমিতে কেউ যত্ন নেয়নি। সেই কারণেই ফসল কম অথচ মালিকের প্রচুর লাভ। বাঁ দিকের জমিগুলো ছোট ছোট চাষীদের। তারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, জমিতে যত্ন নিয়ে চেষ্টা করেছে বেশি ফসল উৎপন্ন করতে। এই ধরনের অবহেলিত জমি কম নয়। গোটা বাদা অঞ্চলে কয়েক লক্ষ বিঘা জমি এই ভাবে উপযুক্ত ফসল ফলাতে পারছে না।

সরকার আইন সংশোধনও তো করেছে।

শুনেছি। কাগজে কলমে অনেক আইন রয়েছে। কলকাতা থেকে পঞ্চাশ মাইল চৌহদ্দির মধ্যে সেই আইন কতটা প্রয়োগ হচ্ছে তা কেউ জানে কি? কোনদিন মন্ত্রী অথবা এম-এল-এ বাবুরা এ পথে হাঁটে না। ভোট নেবার সময় আসে। এবার তারও দরকার হয়নি। পাইক, বরকন্দাজ পাঠিয়ে ভোটের বাক্সে কারসাজি করে কারবার শেষ হয়েছে। আইন কাগজে থাকলে হয় না দাদা, আইন কাজে প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না তা দেখাও দরকার। যারা আইন প্রয়োগ করার এজেন্ট তাদের মধ্যে দুর্নীতির শক্ত দুর্গ তৈরি হয়ে রয়েছে। যাদের টাকা আছে তারা আইন কিনছে এই সব অসৎ কর্মচারীদের অন্যায় যোগসাজসে।

আপনারা আন্দোলন করেন না কেন?

করি। তাতে ফল হয়নি। হয়ত ভবিষ্যতে হবে। ওরাও আন্দোলন দমন করার পথ জানে। মারপিঠ-দাঙ্গা-খুন-জখম তো আছেই। আরও ভদ্রভাবে অনেকে এগোয়। তারা পুলিশের সাহায্যে আন্দোলনকারীদের নানা রকম মামলায় জড়িয়ে দেয়। এমন লোক আছে যার বিরুদ্ধে ষোলটা পর্যন্ত মিথ্যা মামলা আছে। কেউ হাজতে আছে। কেউ জামিন পেয়ে মাসে দশদিন করে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে ডায়মণ্ডহারবার অথবা আলিপুরে আদালতে। এতে হয়রানি তো আছেই। ঘটিবাটি বিক্রি করে মামলা লড়ার হুজ্জুতও কম নয়।

আরেকটা গ্রামের সীমানায় প্রায় এসে গেছি। গ্রামের বাইরে একটা ভাঙ্গা বাড়ি দেখিয়ে সুশীল নস্কর বলল, কলকাতার সেই মালিকদের এখানে ছিল কাছারীবাড়ি। জমিদারী বাজেয়াপ্ত হবার পর এটাই হয়েছিল তাদের খামার বাড়ি। এখানে গত বৎসর পর্যন্ত ষাট-সত্তরটা বিরাট বিরাট মড়াই ছিল। মালিকরা বন্দুক-রাইফেল নিয়ে অগ্রহায়ণ মাসে আসে। তখন বাড়িটাকে বাসোপযোগী করা হয়। ধান-সম্পত্তি নিয়ে মালিকরা চলে যাবার পর এই রকম পোড়ো বাড়ির মত থাকে।

কেউ দেখাশোনা করে না?

করে। যে লোকটি দেখাশোনা করে সে কয়েক বছর আগে সাত বছর মেয়াদ খেটে এসেছে ডাকাতির দায়ে। তারই দলবল ধান কাটার সময় মালিকের পক্ষে লুটতরাজ দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে। সারা বছরের খাবার পায়। আর সিজিন শেষ হলে এই বাড়িতে তাড়ির আড্ডা জমায়।

তাকিয়ে দেখছি আর চলছি।

সুশীল নস্করের বক্তব্য যেন শেষ হতে চায় না। পথও যেন শেষ হতে চায় না। ভারতীকে বিশেষ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। সূর্য তখন পাটে রয়েছে। সামনে আর কতটা পথ তাও জানা নেই। অবস্থাটা উপলব্ধি করে সুশীলকে জিজ্ঞাসা করলাম, আর কত পথ বাকি?

সামান্য পথ। এই গ্রামেই আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করব। এখানে চা-টা খেয়ে পাশের গ্রামে গন্তব্যস্থলে গিয়ে রাত কাটাব।

কিছুটা এগিয়ে যাবার পর সুশীল বলল, সামনে জয়াবতীর বাড়ি। এখানে আপাততঃ বিশ্রাম নিতে পারবেন।

জয়াবতী আবার কে?

তার পরিচয় তার কাছেই পাবেন। তার স্বামী শঙ্করও পরিচয় দিতে পারে। এমন একটা জীবনের সঙ্গে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে পরিচিত হয়ে নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন। এই যে বাড়ি।

তাকিয়ে দেখলাম। মাটির দেওয়াল ঘেরা দুটো দিক। অপর দুই দিকে দুটো মাটির ঘর। সদর দরজায় বাঁশের ঝাঁপ। ঝাঁপটা খোলাই ছিল। সুশীল এগিয়ে গিয়ে ডাকল, জয়াদিদি আছ বাড়িতে।

ভেতর থেকে উত্তর এল, বলল, তোমরা ভেতরে এস। তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছি সুশীলদা।

আমরা ভেতরে প্রবেশ করেই দেখি বারান্দায় মাদুর পাতা।

সুশীল মাদুর পাতা দেখেই বলল, আমাদের অভ্যর্থনা করতে পাকা ব্যবস্থা করেছে দেখছি। আমরা তো এই পথে না-ও আসতে পারতাম।

জয়াবতী মাথার কাপড়টা একটু সামনে টেনে মৃদু হেসে বলল, আমার সৌভাগ্য যে তোমরা এসেছ। তবে আশা করেছিলাম, এই পথেই তোমরা যাবে। তোমার দাদা তো তোমাদের সেবা করতে জাল নিয়ে বেরিয়েছে।

সুশীল হেসে বলল, এখানে রাত্রিবাস করব তাতো আমরা মনে করি নি।

এবার মনে কর। আমি তোমাদের চা-মুড়ির ব্যবস্থা করছি। পুকুর থেকে হাত-পা ধুয়ে এস ততক্ষণ। সামনেই তো গায়েনদের শান বাঁধানো পুকুর। সেখান থেকেই হাত-পা ধুয়ে এস। আর তুমি দিদি আমার সঙ্গে এস।

কথা শেষ করে জয়াবতী ভারতীর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

ঘটনাটা শুনেছিলাম শঙ্করের মুখে।

অনেক রাত অবধি শঙ্কর আমাদের পাশের চাটাইতে শুয়ে বলছিল তার কথা।

জয়াবতী এই গ্রামের মেয়ে।

ছোটবেলা থেকে শঙ্করের সঙ্গে জয়াবতীর পরিচয়। একসঙ্গে খেলা করেছে, খালে-বিলে কাদা-জল ছেঁচে মাছ ধরেছে। পাঠশালায় পড়তে গেছে।

জয়া তখন পড়ত প্রথম শ্রেণীতে।

শঙ্কর পড়ত চতুর্থ শ্রেণীতে।

পাঠশালায় যেত এক সঙ্গে দু'জন, ফিরত এক সঙ্গে।

চতুর্থ শ্রেণীর পড়া শেষ হতেই শঙ্করের পড়ায় ইস্তফা। তার বাবার সামর্থ্য ছিল না কোন ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করার।

শঙ্কর, তুই পাঠশালায় যাস না কেন?—জিজ্ঞেস করেছিল জয়াবতী।

আমার আর কেলাস নেই।

তা হলে পাঠশালায় যাবি না?

কি রে। বাড়িতে পড়ব। এবার বাবার কাজ করব।

আমিও আর পাঠশালায় যাব না।

তোর তো আরও তিনটে কেলাস বাকি।

দূর! পড়ে কি হবে। তুই তো পড়লি, এবার মজুরের কাজ করবি। আমি পড়লেও ধান ভানতে হবে, রান্না করতে হবে। আমি তো পাঠশালায় পণ্ডিতী করব না। তুইও যাবি না, আমিও যাব না।

বালিকা জয়াবতী গম্ভীরভাবে কথা শেষ করে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

কিশোর শঙ্কর জয়াবতীর ব্যথা বুঝতে শেখেনি। জয়াবতীর কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে শঙ্কর নিজের কাজে চলে গিয়েছিল।

সেবার বন্যায় মাঠ ডুবে গিয়েছিল। ফসল আর হল না। অন্নের কষ্ট। জয়াবতীর বাবা ছেলেমেয়ে নিয়ে পাড়ি জমাল কলকাতায়। কলকাতা তো দূরের পথ নয়। কলকাতার ফুটপাত তখন অনাহারীর ভীড়ে কানায় কানায় ভর্তি। শেয়ালদহ স্টেশনের চত্বরে রাতের বেলায় দুঃস্থ লোকের ভীড়। পা ফেলবার মত জায়গাও নেই।

জয়াবতী কখনও কলকাতা দেখেনি। বয়সও তার কম নয় সতর-আঠার পেরিয়েছে। মায়ের সঙ্গে পাড়ায় বের হয়, আর্তস্বরে চিৎকার করে 'কিছু আছে মা'। শহর কলকাতায় সব আছে, নেই শুধু মানুষের উপযুক্ত দরদ। সারাদিন

পথে পথে ঘুরে শুকনো রুটি যা জোটে তা দিয়ে একবেলার খাবার সংস্থান হয়। জয়াবতীর বাবা মোট বয়। তাতেও রোজগার হয়। কিন্তু প্রয়োজনের সামান্য অংশও মেটে না। প্রয়োজনও তাদের খুবই কম, তবুও তা মেটে না।

কাঞ্চনবালা থাকে তাদের পাশেই।

প্রথম প্রথম তাদের মতই ভিক্ষা করত। কিছু দিন পরে কাঞ্চন আর ভিক্ষায় বের হত না। নতুন একখানা শাড়ি কিনেছে কাঞ্চন। সন্ধ্যাবেলায় শাড়িখানা পড়ে কপালে টিপ দিয়ে কোথায় যেন যায়। সকালবেলায় ফিরে আসে। ভিক্ষান্নে তাকে পেট ভরাতে হয় না, সে সামনের গলিতে পাইস হোটেলে পেট ভর্তি খেয়ে এসে মুসাফির খানার এক কোণায় সারাদিন ঘুমোয়।

কাঞ্চন বলত জয়াবতীকে, আমার স্বামী খেতে দেয় না। একটা ছেলে নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াই।

তোর ছেলে কোথায় রে কাঞ্চন?

মরেছে। বেঁচেছি। সারাদিন খিদের জ্বালায় কাঁদত। আমিও হাত পা ছড়িয়ে বেড়াতে পারতাম না, কোথাও কাজ করতে পারতাম না। ছেলেটা মরেছে, এবার বেঁচেছি।

তোর স্বামীর কাছে যাস না কেন?

ঠোঁট উল্টে কাঞ্চন বলত, গিয়ে আর কি হবে! সে আমার মাসিকে নিয়ে ঘর করছে।

জয়াবতী আশ্চর্য হল না কাঞ্চনের কথায়। এ রকম হামেশাই হয়। তাদের গাঁয়ের পানু সরদার বিয়ে করেছিল অন্নদাকে। অন্নদার বিধবা মা মেয়ের বিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। পানুর বিয়ের পর পানুর ছোট ভাই ভানুর সঙ্গে মালা বদল করে অন্নদার মা ঘর পেতেছে। বড় ভাইয়ের শাশুড়িকে বিয়ে করা যেমন নতুন নয় তেমনি কাঞ্চনবালাকে তাড়িয়ে দিয়ে তার বিধবা মাসিকে নিয়ে ঘর বাঁধাও নতুন ঘটনা নয়।

জয়াবতীর মা জিজ্ঞেস করল, তুই আবার বিয়ে করলি না কেন?

ছেলেটার জন্য পারিনি দিদি। ছেলেটা মরতেই হাত-পা ঝাড়া হয়েছি। এবার যা হয় করব।

কাঞ্চনবালা এসব যাই বলুক না কেন, চুপি চুপি জয়াবতীকে বলেছিল, বিয়ে আর করব না রে জযি। ওসব মরদ খেতে দেয় না, ঠ্যাঙ্গায়। তার চেয়ে লাইন ভাল, অনেক পয়সা।

জয়াবতী বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করল, লাইন কি রে?

জানিস না। রাতের বেলায় যেতে হয়। রাতভর মরদদের সঙ্গে থাকতে হয়। নগদ টাকা দেয়। সব দিন তো একজন মরদ থাকে না, পাওয়াও যায় না। রোজ নতুন। দাম দর করে নিলে অনেক টাকা।

জয়াবতী আর কোন কথা বলতে পারে নি। চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবছিল।

কি ভাবছিস? খুব খারাপ কাজ? তা তো আমিও জানি। ভাল কাজ করে পেট যদি না ভরে খারাপ কাজ কেন করবি না। তোদের তো খুব কষ্ট। তুই তো লাইনে আসতে পারিস। তোর দাম বেশি হবে রে। প্রত্যেক রাতে পাঁচ থেকে দশটাকা।

জয়াবতী কেমন ভয় পেয়ে গেল।

বলল, ওসব কথা বলিস না কাঞ্চন। কষ্ট হচ্ছে ঠিকই। আবার ঘরে ফিরব। আবার পেট ভর্তি খেতে পাব।

কাঞ্চন আর কোন কথা বলেনি। জয়াবতী বুঝতে পেরেছে কলকাতার নিচের তলায় তাদের মত মানুষদের জীবন। কাঞ্চনকে আর ভাল লাগত না।

শঙ্করদেরও অবস্থায় টান পড়েছে। গত বছরের ধান ফুরিয়েছে। এ বছরও বিশেষ আশা নেই। তবে শঙ্কর অনেক আগেই সোনারপুরে এসে ফকির মামুদের আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছিল। ফকির মামুদ রাজমিস্ত্রি, শঙ্কর তার জোগানদার হয়ে কাজ করেছে তিন-চার বছর। এরপর সে হয়েছে পাকা মিস্ত্রি। ছ'টাকা আট টাকা রোজে কাজ করে। সবদিন কাজ না থাকলেও যা উপার্জন হয় তাতে তার চলে যায়, কিছু কিছু টাকা তার বাবাকেও পাঠায়।

শঙ্করের বাবা ভাগচাষী হলেও ভদ্রাসনের সংলগ্ন প্রায় এক বিঘে-জমিতে তরকারির চাষ করে। মুরগী পালন করে। তরকারি বিক্রি করে তেল নুনের খরচ ওঠে, সম্বৎসরের কাপড়-জামাও হয়। শঙ্কর টাকা পাঠায় তা দিয়ে চাল-ডাল সংগ্রহ করে দিন কাটায় কোন রকমে।

শেয়ালদহ স্টেশনে নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। ঠিকাদার ঢালাইয়ের কাজের মিস্ত্রি খুঁজছে শুনতে পেয়ে শঙ্কর গিয়েছিল শেয়ালদহে। স্টেশনের সামনে দেখা হয়েছিল জয়াবতীর মায়ের সঙ্গে।

অবাক হয়ে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করেছিল, মাসি তুমি এখানে কেন?

জানিস না বুঝি, দেশে আকাল, খেতে না পেয়ে কলকাতায় এসেছি। ভিক্ষা

করছি, তোর মেসো মুটের কাজ করছে।

শঙ্কর অবস্থাটা বুঝে অন্য কথা না বলে নিজের কাজে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, আমার একটু জরুরী কাজ আছে। তোমরা তো এখানেই আছ। আমি ফেরবার পথে দেখা করব।

ফেরবার সময় শঙ্কর খুঁজে বের করেছিল জয়াবতীর মাকে। তখন জয়াবতী পাশে বসে কোলেবাজার থেকে কুড়িয়ে আনা আনাজগুলো থেকে ভাল অংশ কেটে একটা মাটির গামলায় রাখছিল। অনেক দিন পর শঙ্কর জয়াবতীর সাক্ষাৎ। জয়াবতী যে কত বড় হয়েছে সে খেয়াল ছিল না শঙ্করের। জয়াবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুই অনেক বড় হয়েছিস দেখছি।

লজ্জায় জয়াবতীর মুখ লাল হয়ে উঠল।

চিনতে পেরেছিস তো? মাথা নাড়লেই হল। মনে আছে পাঠশালা ছাড়ার কথা। আচ্ছা, বেশ বেশ। এই ফুটপাথে কে তোদের পাঠিয়েছে বলত?

জয়াবতী মৃদু স্বরে বলল, এখন নয়, পরে বলব। তুমি কি আজ বাড়ি যাবে?

শঙ্কর হেসে বলল, বাড়ি ছেড়েছি সেই আট বছর আগে। থাকি সোনারপুর। সেখানেই ফিরে যাব। কোন দরকার আছে কি?

দরকার এমন কিছু নয়। ফুটপাথে যারা থাকে তাদের দরকার থাকে না কোন কালেই।

অবাক হয়ে শঙ্কর জয়াবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এমন ভাবে জয়াবতী কোন দিন কথা বলবে তা ভাবতেও পারেনি।

কি ভাবছিস শঙ্করদা?

ভাবছি তুই এত শিখলি কি করে?

নানাভাবে শিখেছি। আমার বাবার শেষ সম্বল তিন বিঘে জমি যখন হাত ছাড়া হয়ে গেল তখন থেকে শিখতে আরম্ভ করেছি। আজও শেখা শেষ হয়নি। কলকাতার এই ফুটপাথে আরও কিছুদিন থাকলে আরও শিখতে পারব।

শঙ্কর হঠাৎ বলল, তোদের খুব কষ্ট, তাই না?

জয়াবতী হেসে উঠল।

ঠাট্টা করছিস শঙ্করদা? কষ্ট আমাদের নেই। ক'দিন থেকে ভাবছি, কোন একটা ভাল বাবু পেলে তাদের বাড়িতে বাসন মাজার কাজ নেব। ভিক্ষে করতে আর ভাল লাগছে না। সাহস পাই না। এখানে কাঞ্চন নামে একটা মেয়ে

থাকে। তার কাছে যা শুনেছি তারপর আর কাজ করতে যেতে ভরসা পাই না।

শঙ্কর সব কথা এড়িয়ে বলল, আমার ট্রেনের টাইম হয়ে গেছে। আজ আমি যাচ্ছি। কাল থেকে আমি এখানে ঠিকাদারের কাজ করতে আসব। তখন সব কথা হবে। শোন জয়া, আমার কাছে মাত্র তিনটে টাকা আছে। দুটো টাকা দিয়ে যাচ্ছি, তোরা কিছু কিনে কেটে খাস। আর ভিক্ষে করিস না। কাল আমি একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারব মনে হয়।

রাস্তায় রাস্তায় যে ভিক্ষে করে বেড়ায় তার কোন চক্ষুলজ্জা থাকা উচিত নয়। তবুও জয়াবতী হাত এগিয়ে দিয়ে টাকা নিতে ইতস্তত করছিল।

কি ভাবছিস, ধর টাকা। আমি আর দাঁড়াতে পারব না।

জয়াবতীর হাতে টাকা দুটো গুঁজে দিয়ে শঙ্কর ছুটল ট্রেন ধরতে।

জয়াবতী বিস্মিতভাবে শঙ্করের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এর পর রোজই শঙ্কর জয়াবতীর দেখা হয়েছে। দুজনে বসে বসে গল্প করেছে। একদিন শঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, কে তোদের কলকাতার ফুটপাথে পাঠিয়েছে তাতো বললি না।

জয়াবতী গম্ভীরভাবে বলল, কেরেস্তানদের রমেন নস্কর। আমাদের সর্বস্ব রমেন ঠকিয়ে নিয়েছে।

শঙ্কর বলল, রমেনের তো অভাব নেই।

অভাব নেই বলেই তো এত লোভ। লোভ মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় তা আগে জানতাম না। এখন দেখছি, মানুষ বড় হয় লোভ জয় করলে, মানুষের ক্ষয় হয় লোভ বাড়লে।

তুই বলতে চাস রমেনের ক্ষয় হবে।

হওয়া উচিত। দেখ শঙ্করদা, একটা পিঁপড়েকে পায়ে টিপে মারতে গেলে সেও বাধা দেয়। কামড়াবার সুযোগ পেলে কামড়ায়। আর মানুষকে টিপে মারতে গেলে বাধা আসবেই। যারা সুযোগ পাবে তারাই বাধা দেবে।

শঙ্কর বলল, এককভাবে বাধা দিলে কোন ফল হয় না।

জয়াবতী সঙ্গে সঙ্গে বলল, ঠিক বলেছ। সবাই মিলে বাধা দিতে হবে। যারা অত্যাচার সহ্য করবে তাদের সবাই যদি মিলেমিশে এই সব ঠগীদের বাধা দিতে পারি তা হলে ওদের ক্ষয় হবেই।

শঙ্কর অনেকক্ষণ ভেবে বলল, তোরা দেশে ফিরে যা। এখানে আর কুকুর বেড়ালের মত থাকিস না। সেখানে মাথা গোঁজার মত আশ্রয় নিশ্চয়ই আছে। তোদের আব্রু থাকবে, ইজ্জত থাকবে।

আব্রু আর ইজ্জত ধুয়ে তো কেউ জল খায় না। তাও জানি! এই তো পূজার মাস চলে গেছে। সামনে অগ্রহায়ণ। ধান কাটা আর ধান কুড়োবার সময়। বাবা-মাকে নিয়ে ক্ষেতে কাজ নিবি। আমি দেখি কতটা কি করতে পারি।

তোর টাকা অনেক নিয়েছি। আর নেব না।

কেন? সম্মান যায় বুঝি। ভিক্ষে করতে সম্মান নষ্ট হয় না?

সেটা তো দান। তুই দান করিস না। তোর মতলব বুঝতে পারি না! আমার ভয় হয়।

কি ভয়?

তুই আমার মন জয় করে শেষে যদি লাইনে টানিস।

চিৎকার করে শঙ্কর।

কি বললি!

ভুল হয়েছে। আমাকে ক্ষমা করিস। তবে ভয় তো থাকে।

হাঁ ভয় থাকে। শঙ্কর কিন্তু ন্যাড়া, সে বেলতলা চেনে। দেখ, জয়া, আমরা গরীব। কেন গরীব সেটা তুইও জানিস, আমিও জানি। আমাদের জীবনটা হল লড়াইয়ের জীবন। বাঁচার জন্য আমরা লড়াই করছি। মানুষের মত বাঁচার লড়াইতে হার আছে, জিতও আছে। এখন হারছি বলে কি চিরকাল হারতে হবে। এমন দিন আসবে যেদিন আমাদের জিত হবে। সেদিন আমি আর তুই হয়ত থাকব না। যারা থাকবে তারা বলবে, লড়াই করে আমাদের বাপ-ঠাকুরদা আমাদের পেটের ভাত নিশ্চিন্ত করে গেছে!

জয়াবতী কোন কথা বলেনি।

শঙ্কর বলল, তোরা যাবি কিনা তো বললি না।

আমি বললেই তো হবে না। বাবা-মা কি বলে তাও তো শুনতে হবে।

তা বটে। আমার কথা বলিস। তোর বাবা আরও কিছু দিন কলকাতায় থাকুক। যা উপায় করবে তার একটা অংশ তো তোদের দিতে পারবে! বাকিটা আমি চালিয়ে নেব।

আচ্ছা। কাল তোকে বলব।

পরদিন শঙ্কর আসতেই জয়া বলল, তুই বাবার সঙ্গে কথা বল। বাবা এখুনি বৈঠকখানা বাজার থেকে আসবে। তার সঙ্গে কথা বলবি।

আচ্ছা।

জয়াবতীর বাবা আসতেই শঙ্কর বাড়ি ফিরে যাবার প্রসঙ্গ তুলতেই জয়াবতীর বাবা বলল, তুই তো ঠিকই বলেছিস। কিন্তু আমি না থাকলে গ্রামে সোমত্ত মেয়ে রাখা ভাল হবে কি?

তাতে কি অসুবিধা। আমার বাবা মা আছে, ভাইরা আছে। তারাই দেখাশোনা করবে।

তাও ঠিক কিন্তু মেয়ে বড় হয়েছে। এখনও বিয়ে দিতে পারিনি পয়সার অভাবে।

বিয়েতে পয়সা খরচ কেন করবে মেসো। আজকাল তো বিয়ে সহজ হয়েছে। পাত্র সঙ্গে করে কলকাতায় এসে বিয়ে দেবে। রেজিস্টারের ঘরে বিয়ে হবে। তাতে বিশ পঁচিশ টাকাই বায় হবে।

জয়াবতীর বাবা বলল, কথা তো ঠিক কিন্তু ওরকম বিয়ে সমাজ মানবে কেন? ভোজ দিতে হবে! পাত্রকে জামা কাপড় দিতে হবে। তা কম করেও তিনশ টাকার ব্যাপার।

ওসব কথা ভুলে যাও মেসো। মালা বদলের বিয়েতে অনেক টাকা নষ্ট হয়। এই বিয়েতে টাকা নষ্ট হবে না। সমাজ না মানলেও কিছু এসে যাবে না। সমাজ তো ভোজ খায়, পেটে ভাত জুগিয়ে দেয় না।

পাত্র পক্ষ শুনবে কেন? তারা কিছু না কিছু চাইবে।

ফুটপাথে বসে থাক, ভিক্ষে কর অথচ সমাজ তোমাকে খেতে দেয় না। এমন সমাজের দরকার কি? যে সমাজ খেতে দেয় না, আশ্রয় দেয় না সে সমাজ মরা সমাজ। মরাকে ভোজ খাওয়ানো কি যায়! তুমি দেশে গিয়ে পাত্র দেখ। আমি পঁচিশ তিরিশ টাকা যা দরকার হয় দেব।

পাত্র তো দেখেছিলাম। তারা ওসব রেজিস্টি-টেজিস্টি শুনবে না। নগদ একশ' টাকা পণ দিতে হবে। ভোজ তো আছেই। কাপড়-জামা এসব নিয়ে আরও দু তিনশ' টাকা।

তোমার গুণধর পাত্রটি কে?

তিন নম্বরের শশা মিস্ত্রীর বেটা অমূল্য।

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলল, পাত্রটি তো মন্দ নয়। কিন্তু সে বউকে ভাত দিতে পারবে কি?

খুব পারবে। অসীম হালদারের জোত দেখা কাজ। মাসে মাসে বেতন পায়। খাবার ধান পায়।

কাল যদি অসীম হালদার তাড়িয়ে দেয়।

সেটা কপাল। ভগবান দেখবে। তার জন্য আমি চিন্তা করি না।

তা হয় না কাকা। জোতদারদের পাইক আর বাড়ির কুকুরদের সম্মান একই রকম। কখনও আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, কখনও তাকে লাথি মারে। এ পাত্র বাদ দাও, অন্য পাত্র দেখ। চাষার মেয়ে চাষার ঘরে দিও। পাইক বরকন্দাজ আর গুণ্ডাদের বিশ্বাস কর না। মেয়েটার কপালে দুঃখ এনে দিও না। ওটা বাপের কাজ নয়।

জয়াবতীর বাবা বলল, আচ্ছা ভেবে দেখব।

যাই ভেবে দেখ, দেশে ওদের পাঠিয়ে দাও।

সেটাও ভেবে দেখব। বলে জয়াবতীর বাবা আবার ছুটল নর্থ স্টেশনের দিকে। একটা ট্রেন এসেছে। মাল নামবে। মোট বইবার কাজ হয়ত পাবে। প্রথম প্রথম মোট কেউ দিত না, রেলের কুলীরা বাইরের কুলীদের ওপর জুলুম করত। একটা ভীষণ লড়াই হয়েছিল। সেই লড়াইয়ে কুলীদের অনেকেই জখম হয়েছিল। তারপর থেকে বাইরের কুলীরা কিছু কিছু কাজ পায়।

ফিরতি পথে জয়াবতী জিজ্ঞেস করল, বাবা কি বলল?

বলল, ভেবে দেখব। তার চিন্তা কি করে বিয়ে দেবে। সমাজ কি ভাবে গ্রহণ করবে।

জয়াবতী পায়ের আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বলল, আর কিছু বলল না।

অনেক কথাই বলেছে। পাত্রও নাকি ঠিক করেছিল। টাকার জন্য এখনও বিয়ে হয়নি।

পাত্রটির নাম শুনেছ?

শুনেছি। অসীম হালদারের পাইক অমূল্য মিস্ত্রী।

তাই বুঝি। এবার আমাকে গলায় দড়ি দিতে হবে দেখছি। ভিক্ষে করে খাচ্ছি তাতে দুঃখ নেই কিন্তু অমূল্যের সঙ্গে বিয়ে হলে মরেই যাব।

কেন? কেন?

তা জানো না বুঝি। দেশে যাও না বুঝি? তা হবে। শশা মিস্ত্রী বুড়ো বয়েসে দোজপক্ষ করেছে। আর সেই দোজপক্ষের ছুড়িটা থাকে অমূল্যের সঙ্গে।

কি বলছিস? সৎমা হলেও তো মা।

ওদের কোন ধম্মজ্ঞান নেই শঙ্করদা। বুড়ো স্বামীর চেয়ে জওয়ান ছেলে আরও বেশি লোভের আর লাভের। অমূল্য বুক ফুলিয়ে চলে, ঘরে হাঁপানীর রুগী তার বাবা শশা মিস্ত্রী হাপর টানে। এমন গুণধর না হলে বোধহয় জয়াবতী উদ্ধার হবে না।

তা হলে আমাকে পাত্র দেখতে হবে।

আর দেখতে হবে না। আমার পাত্র আমি-ই দেখে নেব। এখনও সময় হয়নি।

তোর মনের মতন পাত্র পেয়েছিস কি?

পেয়েও হাতছাড়া হবার উপক্রম। সময় হলে সব বলব। তোর আবার গাড়ির টাইম। যা দৌড়ে যা, সাতটা সাতান্ন এখুনি ছাড়বে।

তুই তো সব খবর রাখিস দেখছি। যদি মনের মত পাত্র পাস, আমাকে বলিস, আমি একটু অগ্রিম অগ্রিম আলাপ করে দেখব।

অগ্রিম অগ্রিম আলাপ করতে হবে না। তোর সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ আছে।

শঙ্কর কিছু না বুঝে বলল, কে রে সেই পাত্রটি?

জয়াবতী বলল, যার পাঠশালার পড়া শেষ হতেই আমি পাঠশালা ছেড়েছিলাম।

সহজ সরল ভাবে এমন সুন্দরভঙ্গীতে জয়াবতী যে গুছিয়ে কথা বলতে পারে তা ভাবতেও পারে নি শঙ্কর। মনে মনে হার মানল। মুখে বলল, পছন্দ খুব ভাল হয়নি।

জয়াবতী মুখচোখ রাঙ্গা করে বলল, তা দেখতে হবে না। ওটা আমি বুঝে নেব।

সত্যি সত্যি জয়াবতী বুঝে নিয়েছিল।

পরের বছর জমিতে ধান হয়েছে। জয়াবতী আবার হাত ধরে ফিরে গেছে তাদের গ্রামে। শঙ্করের বাবা এসে পাকা করে গেছে।

একদিন জয়াবতীকে নিয়ে শঙ্কর হাজির হল ঠিকাদারের ওভারসিয়রের কাছে। বলল, আমরা বিয়ে করব বাবু।

ওভারসিয়র অবাক হয়ে বলল, বিয়ে। তা ভাল। তোমরা কালীঘাটে যাও। মালা বদল করে চলে যাও ঘরে।

তা নয় বাবু। বিয়ে হবে রেজেস্ট্রি করে।

রেজিস্ট্রি বললেই তো রেজেস্ট্রি হয় না। এক মাস আগে নোটিশ দিতে হয়। তা কি দিয়েছ?

যা করবার আপনি করুন। সেই জন্যই আপনার কাছে এসেছি।

ওভারসিয়র ছোটলোকদের মতিচ্ছন্ন হয়েছে ভেবে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে বেশ কৌতুক অনুভব করছিল। বলল, বেশ তো, বিকেলবেলায় যাবে। আমি নোটিশটা দিয়ে দেব।

বিকেলবেলায় রেজিস্ট্রারের অফিসে নোটিশ দিয়ে শঙ্কর জয়াবতীকে নিয়ে ফিরে গেল দেশে।

ঠিক একমাস পরে উভয়ের বাবা-মাকে নিয়ে শঙ্কর জয়াবতী হাজির হল কলকাতায় বিয়ে রেজেস্ট্রি করতে।

যা কোন দিন বাদা অঞ্চলে ঘটেনি তাই ঘটালো শঙ্কর আর জয়াবতী। সেই রাতেই মাথায় সিঁদুর আর হাতে লোহা দিয়ে জয়াবতী গেল স্বামীর ঘর করতে। গ্রামের লোক তাজ্জব। ভোজ খাওয়া নেই; তাড়ি খাওয়া নেই, কোন খরচ না করেই বিয়ে। তারা প্রথমে ঘোঁট পাকাল। বলত, শঙ্কর জয়াবতীকে নষ্ট করেছে, জোতদারদের কাছে নালিশ করল। কিন্তু কিছু হল না। জোতদার রেজিস্ট্রারের সার্টিফিকেট দেখে আর কোন কথাই বলল না।

জয়াবতী ঘর বাঁধল শঙ্করের সাথে।

অমূল্য মিস্ত্রির মাথায় বাজ ভেঙ্গেছে। সে খুঁজছে শোধ নেবার পথ। শঙ্কর মোটেই বুঝতে পারে নি তার অলক্ষ্যে ভয়ঙ্কর শত্রু অপেক্ষা করছে জয়াবতীকে কেড়ে নিতে।

সেও এক ভয়ঙ্কর রাত। প্রবল ঝড় উঠেছে। এমন সময় দেখা গেল শঙ্করের বাড়িতে আগুন লেগেছে। সে আগুন ছড়িয়ে পড়ল অন্ত্যজ শ্রেণীর বস্তিতে। জয়াবতীর বাবার বাড়িও পুড়ে শেষ। পরদিন সকালে ছয় সাতটি পরিবার খোলা আকাশের তলায় এসে দাঁড়াল।

শঙ্কর বলল, আমাদের জন্য খোলা আকাশই আশ্রয়।

জয়াবতী সব বুঝে বলল, আমরা প্রস্তুত। কিন্তু ওদের বড় দুঃখ। ওরা তো আমাদের মত শক্ত মন নিয়ে লড়াই করতে পারবে না।

মেনে নিতে হবে দুর্ভাগ্যকে, লড়াই করতে হবে। যারা পারবে না তারা নিষ্পেষিত হবে অত্যাচারীর পায়ের তলায়।

শঙ্করের মুখে শুনেছিলাম। এমন সময় জয়াবতী বাধা দিয়ে বলল, আর বলতে হবে না। তোমার এই কাহিনী আর না শোনালেও দাদা বুঝতে পারছেন।

প্রেম কাহিনী বুঝতে পারলেও আমাদের লড়াইগুলো কি ভাবে চলছে তা বুঝতে পারেন নি। সেই জন্যই সব ঘটনা বলতে হচ্ছে। একটার পর একটা যেন কেউ সাজিয়ে রেখেছে। পরপর ঘটনাগুলো লাইন দিয়ে একটার পর একটা এসেছে আর আমরা লড়াই করেছি। লড়াই করতে করতে অনেকসময় মনে হয়েছে আমরা বোধ হয় বাঁচতে পারব না।

আগুনে তো পুড়ে গেল। আমার বাবা-মা উঠে গেল ফুলতলী গাঁয়ে। সেখানে ঘর তুলল। ছোট ভাই দুটো মেয়েদের মত ঢেঁকিতে ধান ভেনে চাল তৈরি করত। সেই চাল নিয়ে যেত বাজারে। একমণ ধানে তিরিশ বত্রিশ সের চাল হয়। দু সের চাল রাখত পেট ভর্তি করতে। বাকি বাজারে বিক্রি করে মূলধন আর লাভ নিয়ে ঘরে ফিরত। সেই লাভের পয়সাতে কোন রকমে দিন চলত, বাকিটা আমি পূরণ করতাম রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। এখন সেটাও বন্ধ। পুলিশের উৎপাতে নদীর ওপারে চাল নিয়ে যাওয়া যায় না। লাভের কড়ি থাকে না, কোন রকমে পেটের ভাতটা হয়, মজুরী পোষায় না।

জয়ার বাবা-মা সেই যে দেশ ছেড়েছে এখনও কোন পাত্তা নেই। কলকাতার ফুটপাথে আশ্রয় নিয়ে ধুকে ধুকে হয়ত মরতে বসেছে। আমি একটু এগিয়ে এসে এখানে ঘর বেঁধেছি। বাবা-মাকে ডাকলেও আসে না। ছোট ভাইরা আসতে দেয় না।

এই জমিটা ছিল জমির শেখের। আট কাঠা জমি। জমিরের দুনিয়াতে কেউ ছিল না। সারা জীবন জমির আশায় জোতদার জমিদারের সঙ্গে কাজিয়া করেছে, ছয়বার জেল খেটেছে। জেলে থাকার সময় তার বউ খেতে না পেয়ে পালিয়ে গেছে দুটো মেয়ে নিয়ে। কোথায় গেছে কেউ জানে না। শোনা গেছে, জমিরের বউ ক্যানিং-এর কাছে কোন্ বড়লোক মুসলমানের ঘরে চাকরাণীর কাজ করে। জমির জেল থেকে ফিরে এসে দেখল তার ঘর খালি। বয়স অনেক হয়েছে, অনেক লড়াই করে সেও ক্লান্ত। একদিন আমাকে বলল, আমি তো আর বাঁচব না বেশি দিন। তোকে এই জমিটা লেখাপড়া করে দিতে চাই।

বললাম, কেন চাচা? চাচী তো ফিরে আসতে পারে।

সে আর আসবে না। আমরা পুরুষরা একটা ধর্ম নিয়ে লড়াই করে ফৌত হতে পারি। আমাদের ঘরের মেয়েরা তা পারে না। সে আর আসবে না। একবার আমার মেয়ে দুটোকে যদি দেখতে পেতাম। যাই হোক, এই বাস্তুর ওপর নজর আছে সমসের মণ্ডলের। এই সমসের হল আমার দুষমন। সারা জীবন আমাকে কষ্ট দিয়েছে। ওসব কথা আজ তো বলে লাভ নেই। তুই বাপু, এই জমিতে উঠে আয়। এখানে থাকবি। তোকেই দিয়ে যাব।

বললাম, চাচা, আমার সঙ্গে সমসের মণ্ডলের ঝগড়াটা বাধিয়ে দিতে চাও বুঝি?

দেখ বাপু, আমি বুড়ো মানুষ, আমার কথা শোনা উচিত। সিধু লোহারের ঘরে গেলে দেখতে পাবি। লোহা তাতিয়ে লাল করে পেটাতে থাকে। পেটাতে পেটাতে হাতিয়ার তৈরি করে। আমরা সেই লোহা। দুনিয়ার ময়দানে পিটুনি খেতে খেতে শক্ত হাতিয়ার হয়েছি। আমাদের কথার দাম আছে। আমি কি জানতাম—সারাজীবন আমাকে বড়লোকের অত্যাচার সহ্য করতে হবে, আমার ঘর সংসার সব কিছু ভেস্তে যাবে। তুই ভাল হয়ে থাকতে চাইলেও থাকতে পারবি না, তার চেয়ে যদি প্রথম থেকেই লড়াকু মন নিয়ে ময়দানে হাজির হতে পারিস তা হলে দেখবি, দুষমণ তোকেই ভয় পাবে। সুযোগ পেলেই ক্ষতি করবে ঠিকই কিন্তু সাহস করে সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

জমির শেখের পোড়ো বাড়িতে উঠে আসার আগে জয়াবতীকে জিজ্ঞেস করলাম, বাবার সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তারপর একদিন জমির শেখ আমার নামে এই বাস্তু লিখে দিয়ে মারা গেল। বাড়ির পেছনে জমিরকে কবর দিলাম। সেই থেকে আমরা এই বাড়িতে আছি। ঘর দুয়ারের চেহারা বদল করেছি। মেহনত করে মাটির দেওয়াল দিয়েছি। আমি তো বছরে ন'মাস বাইরে থাকি, তিন মাস থাকি বাড়িতে। তাও একটানা নয়, শনিবার রাতে আসি, সোমবার ভোর রাতে উঠে রওনা দেই, কোন কোন সময় কাজকর্ম না থাকলে দু দশ দিন ঘরেও থাকি। জয়া একা থাকে। তার জন্যই মাটির দেওয়াল তুলে দিয়েছি।

শঙ্কর থামতেই ভারতী জিজ্ঞাসা করল, জয়ার একা থাকতে ভয় করে না?

জয়াবতী মৃদু হেসে বলল, হাঁ, ভয় করে। তবে জমির শেখ আমাকে পাহারা দেয়।

জমির তো মারা গেছে।

তার কবর আছে। সাধারণ লোকে ভূতের ভয়ে এদিকে আসে না।

অসাধারণ লোক তো আছে।

তা আছে। আমার হাতের কাছে হাতিয়ার তো থাকে।

তুমি একা! আশেপাশে বিশেষ কোন বসতি নেই। কতক্ষণ আর বাধা দেবে। গুণ্ডারা তোমার মুখ বেঁধে টেনে নিয়ে যেতেও তো পারে।

এ কথা আমার যে মনে না হয়েছে এমন নয় কিন্তু ভয়ের বাঘটা এখনও দূরে, যতক্ষণ বাঘটা লাফিয়ে না পড়ছে ততক্ষণ ভয়ে মরে তো লাভ নেই। যদি বাঘটা ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তখন বাঁচার পথটাও খুঁজে পাব। খুব অসতর্ক তো থাকি না।

আমি বললাম, সমসের মণ্ডল কি চুপ করে বসে আছে?

না। সমসের নিশ্চয়ই সুযোগ খুঁজছে। অসুবিধা হল গ্রামে দুটো তিনটে দল আছে। একদল আরেক দলের সঙ্গে মিলেমিশে কোন কাজ করে না। যার জন্য সমসের কিছু করার মতলব এঁটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খবরটা আমাদের কানে এসে যায়। আমাদেরও তো অনেকে ভালবাসে, তাদের খবর দিলেই তারা পাহারাদারী করতে থাকে। সমসের একবার ঘরে আগুন দেবার মতলব এঁটেছিল। খবর পেয়ে আমাদের লোকেরা সমসেরকে শাসিয়ে দিয়েছে। যদি শঙ্করের ঘরে আগুন দাও তা হলে তোমাদের গুষ্টিশুদ্ধ সবাইকে পুড়িয়ে মারব। তারপর থেকেই ঠাণ্ডা। আগে পুকুরে গেলে কয়েকটা ফচ্‌কে ছোঁড়া টিটকারী দিত। একদিন ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে যেতেই তারা পালিয়েছে। এইভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়। ভয় পেলেই ওরা আরও শক্তভাবে চেপে বসবে। সেটা হতে দেব না।

তোমাদের ছেলেমেয়েরা কোথায়?

জয়াবতীর বদলে শঙ্কর উত্তর দিল।

আমাদের একটাই ছেলে। আমার মা-বাবার কাছে আছে।

কত বড় ছেলে?

প্রায় তিন বছরের।

এতটুকু ছেলে সেখানে কি করে আছে। আর তোমরাই বা কেমন করে ছেলে ছেড়ে থাক।

শঙ্কর হাসল?

হাসছ কেন?

দিদি কি এর আগে কখনও বাদায় এসেছেন? আসেন নি। দু'চার দিন থাকলেই দেখতে পাবেন। রাস্তা-ঘাটে অনেক ছেলেমেয়ে দেখতে পাবেন, তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, তোদের বাবার নাম কি?—তারা বাবার নাম-ই বলতে পারবে না। জিজ্ঞেস করবেন, কোন্ গাঁয়ে বাড়ি?—তারা গাঁয়ের নাম বলতে পারবে না। তবে তাদের কোনটা ঘর তা চিনিয়ে দিতে পারবে।

বুঝলাম না তোমার কথা।

বাদার গরীব মানুষদের ছেলে-মেয়ে জন্ম হলেই তারা ছুটতে থাকে পেটের দায়ে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে যেমন সাইনবোর্ড থাকে, এই রাস্তা মহুয়াপুর, এই রাস্তা কুলতলী, এই রাস্তা জয়নগর, এই রাস্তা পাথরপ্রতিমা, তেমনি এইসব ছেলে-মেয়েদের গলায় একটা নামের সাইনবোর্ডকে থাকে। বাবা-মায়ের দেওয়া নাম। কেউ ভিগু, কেউ খেঁদী, কেউ রসিদ, কেউ আমিনা। এই পর্যন্ত। সাইনবোর্ড দেখে রাস্তা চলতে চলতে যেমন দিন কেটে রাত হয়, তেমনি এদের নামের সাইনবোর্ডের শেষ কিনারায় পৌঁছলে বাপের নাম পাওয়া যায়। সেই বাপের নাম খুঁজে বের করতে দিনরাত উৎরে যায়। ওরা জন্তু নয়। মানুষের বাচ্চা এটাই ওদের পরিচয়। সেই দেশের জলবায়ুতে আমার ছেলে বড় হচ্ছে। তার প্রয়োজন শুধু বাঁচা। আমার বাবা-মা সেদিকে নজর রাখে।

তারা তো তোমাদের কাছে এসে থাকতে পারে!

পারে। মাঝে মাঝে আসে। দুটো ভাইকে ছেড়ে আসতে পারে না। ভাইরা বিয়ে করেনি। তাদের জন্য ধান কিনতে হয় চাষীর বাড়ি থেকে। মা ধান সেদ্ধ করে, শুকোয় তবেই তো পেটের ভাত। তারা এখানে এলে পেটের ভাতে টান ধরবে দিদি। তার চেয়ে এই তো ভাল।

কি জানি এ তোমাদের কেমন ভাল। আমরা হলে পারতাম না।

আপনারা তো ভদ্রলোক। আপনারা যা পারবেন না, আমরা তা পারি। আমাদের মত উপোস দিতে পারেন কি? আমাদের মত অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে পারেন কি? আমাদের মত ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে ভাঙ্গা ঘরে সারা জীবন কাটাতে পারেন কি? সমানে সমানে তুলনা হয় দিদি। যা অসমান তার সঙ্গে তুলনা করলে ঠাট্টা মনে হয় না কি?

আমি বললাম, তা বটে। তবুও তুমিও তো বাবা। তুমি তো তোমাদের

সমাজের কড়া বিধি নিষেধ ভঙ্গ করে নতুন পথের নতুন পথিকের ভূমিকা নিতে পেরেছ। এক্ষেত্রেও তুমি কিছু আদর্শ স্থাপন করতে পারতে।

ওটা যে আদর্শ, তা আমরা বিশ্বাস করি না। সোনারপুরে থাকি। মাঝে মাঝে কলকাতায় যাই। কখনও কখনও এক নাগাড়ে অনেক দিন কলকাতায় কাজ করতেও হয়। আমার বিয়ের সময় আমি শেয়ালদহ স্টেশনে কাজ করতাম। সেই সময় দেখতাম কলকাতার মানুষদের কাজকর্ম। একদল বাসিন্দা, আরেক দল নিত্য আসে ভাসতে ভাসতে নিত্য ফিরে যায় ভাসতে ভাসতে। এই দু'জাতের মানুষের জীবন ধারাও আলাদা। বাইরের মানুষগুলো কেমন ব্যস্ততা নিয়ে শহরে ঢোকে, আবার সন্ধ্যার সময় দুর্ভাবনা নিয়ে বাড়িতে ফেরে। তাদের চেহারা আলাদা। সবাই বলে, বাড়ি ফেরা হবে তো! ঘরে ফিরে সবাইকে বহাল তবিয়তে পাব তো? আর যারা বাসিন্দা তারা বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যাবেলায় ভীড় জমায় শনিপূজায়, অথবা মাঠে-ময়দানে। তারা ব্যস্ততার বাইরে জীবনকে মোটামুটি উপভোগ করতে চায়। এই জীবনের সঙ্গে কলকাতার অতি কাছের মানুষ এই বাদার মানুষদের কথা চিন্তা করে দেখুন। এখন রাত কত হবে? বারটা বেজেছে হয়ত, কিন্তু রাত আটটার পর রাস্তায় পা দিলে মনে হবে শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শান্ত সরল নির্জন এই বাদার মাটিতে কতটা আতঙ্ক জমা আছে তা বোঝা যায় রাত যত গভীর হয়। এই মানুষগুলো ভাগ্যের পরিবর্তন করতে শনিতলায় যায় না। মাঠ-ময়দানে হাওয়া খেয়ে সিনেমা দেখে মদের দোকানে বসে জীবনকে উপভোগ করার কোন কথা চিন্তাই করতে পারে না। আবার সকালের ব্যস্ততা আর বিকালের দুর্ভাবনা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না। এদের সারাদিন রাতের কাজ হল, কি করে পেটে একমুঠো ভাত দেবে। এখানে নতুন আদর্শ স্থাপন করতে প্রয়োজন হল আত্মরক্ষার পথ খুঁজে বের করা আর ওদের আত্মরক্ষার পথ দেখানো। এ বিনা অন্য কোন আদর্শ এখানে কোন কাজ করতে পারবে না। এই জীবনের সঙ্গে আপনাদের জীবন অথবা শহরের জীবনের কোন তুলনাই হয় না। শহরের মানুষের সম্পদ আছে। দেশকে শোষণ করে সম্পদ জমা হয় শহরে। সেই সম্পদ তারা নিজেদের ভোগে লাগাতে ব্যস্ত। আর গ্রামের শোষিত মানুষরা ধুঁকছে কি ভাবে তারা বাঁচতে পারে সেই চিন্তায়।

প্যাঁচার ডাক শোনা গেল।

ইসুফ তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

জয়াবতী তেলের প্রদীপ জ্বেলে বলল, আপনারা এবার শুতে চলুন। সুশীলদা তুমি ভাইয়ের পাশেই শুয়ে পড়।

তোমরা?

আমরা রান্নার বারান্দায় রাত কাটিয়ে দেব। আমাদের জন্য চিন্তা কর না। দাদার কোন কষ্ট যেন না হয়। দাদা তো এই জীবনের সঙ্গে মোটেই পরিচিত নন।

বললাম, একখানা শোবার ঘর। তাও আমাদের ছেড়ে দিতে যদি হয় তা হলে অবিচার করা হয়। আমার একটা প্রস্তাব আছে, ভারতী আর জয়া শোবার ঘরে যাও, আমরা ক'জন এই বারান্দায় মাদুর পেতে রাত কাটাতে পারব।

আমার প্রস্তাবে সবাই সম্মতি দিল।

পাশাপাশি মাদুরে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার পাশে ইসুফ-সুশীল তখনও ঘুমোচ্ছিল। শঙ্কর কখন যে উঠে গেছে জানি না। তাকিয়ে দেখলাম, জয়া গরুর গলার দড়ি ধরে দরজা খুলে বাইরে যাচ্ছে।

সকালবেলায় এক বাটি করে গরম দুধ আর মুড়ি বেশ সতেজ করে তুলল।

শঙ্কর বলল, আপনারা তো যাবেন কদমতলা। এখান থেকে খেয়ে দেয়েই যেতে পারবেন। এক ঘণ্টার পথ। বারটার মধ্যে রওনা হতে পারবেন।

বললাম, দেরী হয়ে যাবে। তার চেয়ে এখনই রওনা হতে পারলে ভাল হত।

জয়াবতী উঠোন পরিষ্কার করছিল। আমাদের মাঝখানে ঝাঁটা হাতে দাঁড়িয়ে পড়ল। কোন আদেশ দেবার মত গলায় বলল, কাল রাতে ভাল খাওয়া দাওয়া হয়নি। আজ এ বেলায় না খেয়ে যেতে দেব না। বিকেলবেলায় আপনাদের শঙ্কর যাবে সোনারপুরে। আমিও ঘরে তালা দিয়ে আপনাদের সঙ্গে ক'দিনের মত পথে পথে ঘুরতে পারব।

আমি ভারতীর মুখের দিকে তাকালাম। ভারতীও কিছুটা বিস্মিতভাবে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি অনুমান করেই চুপ করে গিয়েছিলাম। হঠাৎ কৌতুক অনুভব করে বললাম, তোমার আদেশ আর ঝাঁটা দু'টোতেই ভয়।

জয়াবতী হাত থেকে ঝাঁটা ফেলে দিয়ে জিব কেটে বলল, কি যে বলেন দাদা!

বলছিলাম সাক্ষাৎ রণ-রঙ্গিণী তোমার মূর্তি। দু'ঘা বসিয়ে দিলে আর রক্ষা নেই।

আর লজ্জা দেবেন না। দয়া করে বোনের সেবা এ বেলায় গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন।

বিকেলবেলায় আমরা বের হলাম। বের হবার আগে জয়াবতী তার গরু দুটো পাশের বাড়ির জিম্মায় দিয়ে এসে নিশ্চিন্ত হল। শঙ্কর উল্টো পথ ধরল, আমরা কদমতলার পথ ধরলাম।

আমি আর ইসুফ নির্বাক।

পেছনে ভারতী আর জয়াবতী। তারা খোস মেজাজে গল্প করতে করতে গজেন্দ্রগতিতে পা ফেলছে। আমরা কিছু দূর এগিয়ে দাঁড়াচ্ছি। তারা সাথ ধরলেই আবার চলছি। ফাঁকা মাঠ। মাঠের মাঝ দিয়ে বাঁধের ওপর দিয়ে পাশাপাশি দু'জন চলার মত পথ। চাষের সময় খেতের জল বের করে দিতে কোথাও কোথাও বাঁধ কেটে দিয়েছিল। সে সব জায়গায় এখনও গর্ত আছে। সমুদ্র আমাদের কাছ থেকে দূর নয় অথচ খেতের আঁঠালো মাটি যেন পাথরের মত শক্ত। ধান কাটা প্রায় শেষ। কোথাও রোদের তাতে জমিতে ফাটল ধরতে শুরু করেছে। কোথাও তখনও জমিতে জল জমে আছে। নিচু জমিতে মোটা ধানের চাষ হয়েছে। সেগুলোও প্রায় কাটা শেষ মেয়েদের চার-পাঁচজনের ছোট ছোট কয়েকটা দলকে দেখলাম ফাঁকা ধানী জমিগুলোর জায়গায় জায়গায় খুঁড়ছে। মাটি খুঁড়ে কি যেন সংগ্রহ করছে।

ওরা কি করছে?—জিজ্ঞাসা করলাম।

ইঁদুরের গর্ত খুঁড়ছে।

কেন?

ইঁদুর ধান মুখে করে নিয়ে গেছে তার বাসস্থানে। এই সব মেয়েরা গর্ত খুঁড়ে সেই সব বাসস্থান বের করবে। দু'এক সের ধান ইঁদুরের গর্তে পাওয়া যায় সব সময়। কোন কোন গর্তে আধমণ পর্যন্ত ধান পাওয়া যায়। ইঁদুররা খুব সঞ্চয়ী। তারা অসময়ের জন্য ধান মজুত করে তাদের গর্তে। এরা সেই ধান খুঁজছে। চোরের ওপর বাটপাড়ি করার মতলব।

বললাম, এ দিয়ে মেহনত পোষাবে কেন?

উপায় কি! দু তিন দিন শামুক গুগলি খেয়ে দিন কাটতে পারে কিন্তু বেশি দিন তো তা চলে না। মাঝে মাঝে ভাতের মুখ দেখতে এরা ইঁদুরের গর্ত

হাতড়ায়। অনেক গরীব অনাথা মেয়ে বছরে দু তিন মণ ধানও পেয়েছে। এটাই ওদের বিরাট লাভ। আর তো পড়ে রয়েছে বছরের আরও কটা মাস। তখন তো উপোস করেই কাটাবে ওরা। দেখছেন তো দেহের সঙ্গে প্রাণটা রক্ষা করার কত বড় লড়াই ওরা করছে।

ভারতী কি যেন বলল। স্পষ্ট শুনতে পেলাম না। জয়াবতী মাথা নেড়ে সায় দিল।

আবার পথ চলছি।

কদমতলার সীমানায় পা দিয়েছি।

উৎসাহের সঙ্গে জয়াবতী বলল, এবার পৌঁছে গেছি। সামনে হাটতলা। বিকেলবেলায়, গ্রামের ও আশেপাশের অনেকেই এসে জড় হয় হাটতলায়। আপনার বাঁশী পুরকাইতের সঙ্গে এখানেই দেখা হবে। সংবাদ ওরা পেয়েছে। তবে অধৈর্য নিশ্চয়ই হয়েছে। সময় মত তারিখ মত পৌঁছতে পারেন নি, হয়ত চিন্তিত হয়েছে। এই বাদা অঞ্চলে সময় আর তারিখ ঠিক রেখে কাজ কেউই করতে পারে না। আমাদের সময় হল আকাশের সূর্য, আর তারিখ হল উৎসবের দিন দেখে। কাউকে জিজ্ঞেস করুন, সাধারণ মানুষ বলতেই পারবে না আজ কি বার, কত তারিখ। কোন মাকে জিজ্ঞাসা করুন তার ছেলের বয়স। সে হয়ত বলবে, যেবার আকাল হয়েছিল, অথবা যেবার বন্যা হয়েছিল, সেই বার আমার খোকা হেঁটে বেড়াত। মানুষের জীবনে তারিখ, মাস, সাল, সময় যে অতি প্রয়োজনীয় সেটাও এদের শিখতে দেয় নি। তবে সামান্য লেখাপড়া জানা মানুষদের মধ্যে বাংলা মাস আর সাল ও তারিখ জানা যায়। এর কারণ, সেই যে বললাম উৎসব। কোন্ মাসে দুর্গাপূজা, কোন্ মাসে চড়ক, কোন্ মাসে কোন্ পূজা এসব জানার প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে সম্পন্ন-চাষী আর জোতদাররা এসব জানে ও জানিয়ে দেয় সাধারণ মানুষদের। এই তো এসে গেছি হাটতলায়। ভালই হয়েছে। আজ হাট বসেছে। বাঁশীদার দেখা নিশ্চয়ই পাব।

আরে জয়া যে! হঠাৎ এ গাঁয়ে কেন এসেছিস?

জয়াবতী মুখ তুলে মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে বলল, কাজে এসেছি কাকা।

এখানে বুঝি আজ থাকবি?

তাইতো মনে করে এসেছি। আমি তো একা নই কাকা, আমার দাদা দিদিরা

এসেছেন। তাঁরাও কদিন থাকবেন এখানে।

কোথায় থাকবি?

বাঁশীদার বাড়িতে। হাঁ কাকা, বাঁশীদাকে দেখেছ কি?

আরে বাঁশী তো নরেনের দোকানে বসে আছে। কি যেন বলল, বুঝলাম না। কার জন্য বসে আছে। যা নরেনের দোকানে। বাঁশীর ওখানে থাকতে অসুবিধা হলে রাতের বেলায় আমার বাড়িতে আসিস। বেশি রাত করিস না। তোর কাকীর আবার হাঁপানীটা জোর ধরেছে। বেশি রাত হলে তার কষ্ট হবে।

চিকিৎসা করছ না কেন?

করছি রে করছি। এই ঘটেশ্বরতলার মাদুলি এনে দিয়েছি। ফইমপীরের তেলপড়া দিয়েছি।

গম্ভীরভাবে জয়া বলল, কাকা তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। মাদুলি আর তেলপড়া দিয়ে মানুষের ব্যামো যদি সারতো তা হলে লোক ডাক্তার কবিরাজের কাছে যেত কি? আর পয়সা খরচ করে কেউ কি ডাক্তারী-কবিরাজী পড়তে যেত। ওসব ছেড়ে দাও, ডাক্তার-কবিরাজ দেখাও। নইলে কাকী পটল তুলবে।

বলেছিস ঠিকই, কিন্তু ডাক্তার কোথায় পাব। হরিপুরের মোড়ে সামসুল ডাক্তার আছে। সে তো ডাক্তার নয় সাক্ষাৎ যম। আগে কম্পাউণ্ডারী করত, আজ গাঁয়ে এসে ডাক্তার হয়েছে। সেই হরিপুরও তো পাঁচ ছয় মাইল। টাকার তো অভাব। পেটের খোরাক বিক্রি না করে তো ওষুধ কেনা যায় না। ছেলেমেয়েদের উপোস রেখে কি করে চিকিৎসা করি।

জয়াবতী বলল, যা হয় একটা কিছু কর। কাকীকে বলবে আমি এসেছি তবে তোমার বাড়িতে যাচ্ছি না।

জয়াবতী ভারতীর হাত ধরে টানতে টানতে সামনের চায়ের দোকানের দিকে এগিয়ে গেল।

আমরা পেছন পেছন চললাম।

বাঁশীদা।—জয়াবতী ডাকল।

একজন যুবক মাচাং-এ বসেছিল। জয়াবতীর ডাক শুনে তাড়াতাড়ি নেমে এসে জিজ্ঞাসা করল, দাদা এসেছেন কি জয়াবতী?

হাঁ। এই তো? বলেই আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

বাঁশী পুরকাইত আমার দিকে এগিয়ে এসে হাত তুলে অভিনন্দন জানাল।

বলল, গতকাল আপনার আসার কথা ছিল। আমি দুবেলা হাটতলা পাহারা দিচ্ছি। আজ ভাবছিলাম, আপনারা আর আসবেন না।

আমরা হলাম মালগাড়ি, মেল-একস্‌প্রেস নই। হল্টিং স্টেশন অনেক বেশি। যেখানে গাড়ি দাঁড়ায় সেখান থেকে সহজে নড়তে চায় না। সিগন্যাল পেতেই দেরী হয়।

বাঁশী হেসে বলল, আর দেরী করে লাভ নেই। চলুন আমার বাড়িতে। বিশ্রাম করবেন সেখানে। হাঁটতে হয়েছে খুব। এ দিকে তো রাস্তাঘাট নেই, আবার গাড়ি ঘোড়াও নেই। আপনারা শহরের লোক, আপনাদের নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে।

ভারতী বলল, কষ্ট স্বীকার করতে হবে জেনেই তো আমরা এই বাদা অঞ্চলে এসেছি। তার জন্য মোটেই ব্যাজার হই নি। আপনাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছেছি এটাই আমাদের সৌভাগ্য।

ইতিমধ্যে কয়েক গ্লাস চা নিয়ে হাজির হল সুশীল আর জয়াবতী।

ইসুফ বোধহয় চায়ের আশায় ছিল। চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে বেশ উৎফুল্ল ভাবে বলল, কোথাও বসা যাক। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাবে।

তুমি খুব ক্লান্ত কি?

মোটেই নয় দাদা, তবে চায়েরও তো একটা আমেজ আছে সেটা পুরোপুরি উপভোগ করতে চাই। আপনি বুঝি রাগ করলেন দাদা?

বললাম, না, না। রাগ করব কেন! আমাকে নিয়ে আমি চিন্তা করলে হয়ত রাগ করতাম। আমার যে চিন্তা করতে হচ্ছে সঙ্গী-সাথী সবাইয়ের বিষয়। আমার কিছু অসুবিধা হলেও তোমাদের সুবিধা দেখা আমার কর্তব্য। চলুন বাঁশীবাবু, কোথাও বসি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আপনার বাড়িতে যাব।

হাটতলার পাশে একটা বটগাছের পাশেই দক্ষিণরায় আর গাজির মন্দির। সেইখানে গিয়ে বসলাম। গাজির মন্দিরটা দেখে ভারতী জিজ্ঞাসা করল, গাজি তো ঘোড়ার সোয়ার হয়ে বাঘের রাজ্যে পরিচালনা করতে ছুটেছেন, সঙ্গী ওই মেয়েগুলো কে?

গাজির নয়টা মেয়ে আর গাজির বিবি।

আপনারা এগুলোর পূজা করেন?

আমি করি না কিন্তু মৌলা আর কাঠুরের দল পূজা করে। তারা এই পথে সুন্দরবনে যখন কাঠ কাটতে যায় অথবা মধু সংগ্রহ করতে যায় তখন এই

সব মন্দিরে পূজা দিয়ে যায়। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গলের হাত থেকে বাঁচার এটাই তাদের মোক্ষম অস্ত্র। আরও আছে। ওরা অনেক মন্ত্রপাঠ করে বাঘের মুখ বন্ধ করে। এ রকম বিশ্বাস রয়েছে এদেশের অভিযান-প্রিয় বেপরোয়া একদল যুবকের। প্রতিবছর কম পক্ষে পঞ্চাশজন কাঠুরে আর মৌলা বাঘের পেটে আশ্রয় পেলেও এরা কখনও ক্ষান্ত হয় না।

ভারতী বলল, অন্য কোন রুজি রোজগারের পথ নেই বলেই জীবন বিপন্ন করতে বাধ্য হয়।

সেটাও কিছুটা ঠিক, তবে এই অভিযানের আনন্দ ও বীরত্ব অনেককেই টেনে নিয়ে যায় বাঘের রাজ্যে। বাঁচাটা যে লড়াই করা সেটা ওরা জানে। তাই বিপদ জেনেও ওরা কোন সময় পেছ-পা হয় না।

দক্ষিণরায়ের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ইসুফ বলল, হাঁ একটা দেবতার মত চেহারা বটে! একেবারে আল্ট্রা-মডার্ন চেহারা। আমাদের দেশে যে জুলফি-বাবরি অনেক কাল থেকে প্রচলিত, তার প্রমাণ এই দক্ষিণরায়। তারই উত্তর পুরুষ হল বর্তমানের শাসক ও তাদের অনুচররা। তাইতো জুলফি-বাবরির ছড়াছড়ি।

বাঁশী বলল, আরেক কাপ করে হোক দাদা। কিছু খেয়ে নিলে ভাল হত। হাটতলায় তো কিছু পাওয়া যায়। আমাদের চাষার ঘরে মুড়ি-গুড় বিনা আর জল খাবারের বস্তু তো কিছুই পাবেন না।

বললাম, মুড়ি-গুড়ই যথেষ্ট। আমরা মুড়ি-গুড় পেলেই খুশী। সন্দেশ-রসগোল্লা পোলাও কালিয়া খেতে আসিনি। এগুলো যে বাদায় পাওয়া যায় না সেটা জেনেই আমরা এসেছি। আপনাকে এমন কিছু করতে হবে না যার অর্থ হবে আপনার পক্ষে বিলাসিতা এবং ব্যয় বহুল।

বাঁশীবাবু হেসে বলল, ওসব নিয়ে চিন্তা করার অবসর আমার নেই। ওসব চিন্তা করেন আমার বাবা। যাঁর আশ্রয়ে পঁয়ত্রিশটা বছর রয়েছি তার কাজের সমালোচনা আজও করিনি। আলোচনা করার সুযোগ থাকলেও পিতৃদেব কৃত কোন কাজের হিসাব-খতিয়ান করার যোগ্যতা আমার আছে বলে মনে করি না। আমার জন্মের পঁচিশ বছর আগে জন্মেছেন আমার বাবা। তৎকালীন সমাজব্যবস্থা পরিবেশ নিয়েই তিনি বড় হয়েছেন। পঁচিশ বছর পর আমি জন্মে যে সমাজ ব্যবস্থা ও পরিবেশ পেয়েছি সে সমাজ ব্যবস্থা ও পরিবেশকে তিনি যদি আংশিকও গ্রহণ করে থাকেন সেটাই আমার সৌভাগ্য। আর আলোচনা নয় দাদা। এবার চায়ের গ্লাস খালি করেই রওনা হব।

বাঁশী পুরকাইতের পেছন পেছন চললাম। হাটতলার শেষপ্রান্তে এসে বলল, এই জায়গাতে চারজনকে হত্যা করেছিল কয়েকটি দুর্বৃত্ত। এখানে স্মৃতিস্তম্ভ গড়বার ইচ্ছা ছিল। আংশিক তৈরি করে আর অগ্রসর হতে পারিনি অর্থাভাবে।

তাকিয়ে দেখলাম আংশিক নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভের দিকে। চারজনের মৃত্যুর সংবাদ ও পুরো ঘটনাটা আগেই শুনেছিলাম, আর শোনার প্রয়োজন ছিল না। নীরবে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে আবার পথ চলতে থাকি।

ঘড়িতে দেখলাম রাত তখন নটা।

আমাদের খাবার ব্যবস্থা করতে পুরকাইত ব্যস্ত। আমি একটা টেবিল ল্যাম্পের সামনে বসে পুরানো একটা খবরের কাগজের পাতা উল্টাচ্ছি। ইসুফ আমার পাশে একটা পুরানো সাময়িক পত্রিকা নিয়ে শুয়ে পড়েছে। জয়াবতী ও ভারতী অন্দর মহলে বোধহয় আসর জমিয়েছে।

পুরাতন তারিখের কাগজ হলেও আমি মনোযোগ সহকারে পড়ছিলাম।

সামনের আঙ্গিনায় দুটো ধানের গাদা। অন্ধকারে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে। আঙ্গিনা পেরিয়ে ছোট একটা নালা। নালার বুক বেয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের ঢেউ। মাঝে মাঝে পরিবেশকে উপভোগ করার চেষ্টা করছি। ইসুফ কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে টের পাইনি।

পেছন থেকে আওয়াজ এল, নমস্কার।

তাড়াতাড়ি কাগজ গুঁটিয়ে ফিরে তাকালাম।

কথা বলল, জয়াবতী।

বাঁশীদার বাবা। আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন।

আমি ভাল হয়ে বসে দু' হাত তুলে নমস্কার করলাম।

বাঁশী পুরকাইতের বাবা বসলেন আমার পাশে চৌকির উপর। গৌরবর্ণ, সবলদেহী বৃদ্ধ। ষাটের ওপর বয়স। মাথার চুল পরিপাটি কার আঁচড়ানো, তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি, পানের রসে ঠোঁট দুটো লাল। আমার পাশে বসে বললেন, আপনি এসেছেন শুনে আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। শরীরটা কয়েক বছর হল ভাল যাচ্ছে না। আটটা বাজলেই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ি। আজও শোবার উপক্রম করেছি এমন সময় আপনার কথা শুনে আর শোয়া হল না। তা, এখানে আসতে খুবই কষ্ট হয়েছে, তাই না? কি আর করবেন। কলকাতা থেকে দিল্লী যেতে আজকাল সতের ঘণ্টা সময় দরকার হয় আর কলকাতা থেকে

ষাট সত্তর মাইল পথ পেরিয়ে বাদার এই অজ গ্রামে পৌঁছতে কম করেও আট ঘণ্টা সময় দরকার হয়।

বললাম, এদিকে দেখছি একেবারে রাস্তাঘাট হয়নি। অথচ সুন্দরবন উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছে শুনেছি।

আমরাও শুনেছি। তবে উন্নয়নটা নিজের চোখেই দেখে যাচ্ছেন। তবে জানেন কি, ওরা অনেক বলে, কিছুই করে না। যদি বা কিছু করে তার অবস্থা যে কেমন তাও আপনি দেখে যেতে পারবেন।

বাঁশীবাবুর বাবা কিছুক্ষণ থেমে থেকে আবার বলতে লাগলেন।

—আপনি জানেন সরকার বেনামী বহু জমি উদ্ধার করেছিল। সেই জমিগুলোর কিছু কিছু অংশ ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করেছিল। কেউ এক বিঘে, কেউ আধ বিঘে এই রকম পেয়েছিল। এর জন্য প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটও সরকার দিয়েছিল। অর্থাৎ ভূমিহীন কোন কোন কৃষক সামান্য জমির মালিকানাও পেয়েছিল।

এই বণ্টন করে গিয়েছিল কংগ্রেস সরকার।

সেই সরকার ভেঙ্গে গেল, এল যুক্তফ্রণ্ট। তারাও এই জমির সত্ত্বের ওপর কোন রকম বিধিনিষেধ না দিয়ে সার্টিফিকেটগুলো নবীকরণের ব্যবস্থা করেছিল। ইতিমধ্যে যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভেঙ্গে গেল।

চাষীদের ধান কাটার সময়।

রাষ্ট্রপতির শাসনের প্রাককালে পি-ডি-এফ সরকার কায়েম হয়েছে। যাদের বেনামী জমি বণ্টন করা হয়েছিল তারা তৎপর হয়ে উঠল। ভূমিহীন চাষীদের এক-আধ বিঘার ফসল বেনামদার মালিকরা কেটে ঘরে তুলতে লাগল। ধান কাটা নিয়ে নিত্যনৈমিত্তিক অশান্তি। যাতে ধান বে-আইনীভাবে বেনামদাররা কাটতে না পাবে তার জন্য আমার ছেলে তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে প্রচার শুরু করতেই সরকার ধান কাটার হাঙ্গামা রোধে পুলিশ ক্যাম্প বসাল অসীমের বাড়িতে।

পুলিশ ক্যাম্পের কর্তা হল কোন এক সুবেদার শম্ভু মজুমদার।

যারা বে-আইনীভাবে জমির ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের গ্রেপ্তার করা তো দূরের কথা, মৌখিক নিষেধও করল না, উল্টো পথ ধরে যাদের হক্‌পাওনা তাদের মারধর করে জমি থেকে হটিয়ে দিতে লাগল। আমার ছেলে বাঁশী প্রতিবাদ জানাতে লাগল।

তারপর একদিন হাটতলায় আমাদের মারধর করে আমার ভাইয়ের চরম দুর্দশা ঘটিয়েও শান্তি হল না। আমার ভাইয়ের একটা হাত চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। আমাকেও চারদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। ওদের আক্রোশ হল আমার ছেলের ওপর আর আমার ছোট ভাইয়ের ছেলে বসুরাজের ওপর।

সেদিন রাতে খাওয়া দাওয়া করে সবে মাত্র শুয়েছি এমন সময় মনে হল বহুলোক বাহিরের আঙ্গিনায় সোরগোল করছে। বাদা অঞ্চলে ডাকাতের উৎপাত খুব বেশি। আমাদের তিন ভাইয়ের নিকটে বন্দুক আছে। আমরা সোরগোলের শব্দ শুনে মনে করলাম ডাকাত পড়েছে। তাড়াতাড়ি মেয়েদের ছাদে তুলে দিয়ে আমার বড়দাদার তিনছেলে তিনটে বন্দুক নিয়ে ছাদে উঠে গেল।

না, ডাকাত নয়।

দেখলাম সুবেদার মজুমদার, সঙ্গে ছয়জন বন্দুকধারী পুলিশ আর প্রায় পঞ্চাশজন স্থানীয় জোতদারের গুণ্ডা বাড়ি ঘিরে রেখেছে। দরজা খোলার জন্য চিৎকার করছে।

আমি দরজা খুলে সামনে দাঁড়াতেই আমার সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল, তা আপনাকে বলছি।

তোর ছেলে বাঁশী কোথায়?

বাসু শালা কোথায়?

বাসু ছাদে আছে।

তাকে ডেকে আন।

বাসু ওরফে বড়দাদার ছেলে বাসুদেব আমার ডাক শুনে বন্দুকটা রেখে নেমে এল। সে আসা মাত্র দুজন কনেষ্টবল তাকে পিছমোড়া করে বাঁধল।

সুবেদার মজুমদার বলল, তোর ছেলে বাঁশী আজ বিকেলেও বাড়িতে ছিল। নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে। সার্চ কর তোমরা। বাঁশীকে চাই, শালাকে গুলি করে মারব। শালাই সব লোক উস্কে দিয়েছে।

গোটা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বাঁশীকে পায় নি। এই অপরাধে আমাদের তিন ভাইয়ের ঘরের রেডিও, বাসনপত্র যা কিছু পেল তা হাঁতড়ে নিল গুণ্ডারা। শেষ পর্যন্ত বাড়ির বার বছর থেকে বেশি বয়সের সব পুরুষকে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে গেল অসীমের বাড়ির সেই ক্যাম্প ঘরে। বাড়িতে রইল শুধু মেয়েরা আর শিশুরা।

ক্যাম্পে গিয়েই প্রথম বাসুদেবকে মাটিতে শুইয়ে তার গলার ওপর পা তুলে দিল সুবেদার মজুমদার।

বাসুদেবের দম বন্ধ হবার উপক্রম। এমন সময় গুণ্ডাদের একজন টর্চ জ্বেলে বলল, আরে এতো বসু নয়। বাসুদেব। বসু পালিয়েছে।

সুবেদার মজুমদার বলল, এ আসল মাল নয়। ছেড়ে দে শালাকে। মার পিঠে কটা বুটের গুঁতো।

বলতে বলতে বাঁশী পুরকাইতের বাবার চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝড়তে থাকে।

চাদরের খুঁটে চোখ মুছে ধরা ধরা গলায় বলল, আমাদের না পাঠালো থানায়, না পাঠালো আদালতে। দুদিন ওখানে আটক রেখে তারপর পাঠালো থানায়। সুবেদার মজুমদারকে মনে হল, একাধারে পুলিশ, জেল-পুলিশ ও হাকিম। দুদিন ক্যাম্পে থাকার সময় যে সব দৃশ্য দেখেছি তা থেকে মনে হয়েছে এদেশে কোন সভ্য সরকার নেই।

আমি ছিলাম স্থানীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। আজীবন দেশসেবার জন্য ইংরেজ সরকার নানা ভাবে লাঞ্ছিত করেছে কিন্তু কোন সময়ই ইংরেজের পুলিশ আমাদের গায়ে হাত দেয় নি। লবণ-সত্যাগ্রহের সময় আমাদের গ্রেপ্তার করেছিল। বিচারে ছয়মাস কারাদণ্ডও হয়েছিল। আলিপুর জেলে ছিলাম। তখন খেতে পেতাম। রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদা ছিল। কিন্তু আমাদের স্বাধীন দেশে কংগ্রেসী সরকারের আচরণ এত বেশি ঘৃণ্য তা বলে শেষ করা যায় না।

দ্বিতীয়দিন দুজন মুসলমান যুবককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এল। তারাও ভূমিহীন কৃষক। তাদেরও সরকার কিছু জমি দিয়েছিল। তাদের জমির ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছিল বেনামদার মালিকরা। তারা বাধা দিয়েছিল। এই তাদের অপরাধ। যে সরকার জমি দিয়েছে সেই সরকার ফসল রক্ষার জন্য ব্যবস্থা না করে উল্টে তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছিল।

তাদের সঙ্গে যে সব কথা হয়েছিল তাই আপনাকে মোটামুটি বলছি।

একজনের নাম আজিজ।

তুই কেন ধান কাটলি?

আমার জমি আমি ধান কেটেছি। অন্যায় তো কিছু করি নি।

কোন্ শালা বলল তোর জমি।

সরকার আমাদের দলিল দিয়েছে।

তোর বাবা দিয়েছে।

বলেই আজিজকে লাঠি পেটা করতে থাকে।

মারছ কেন তোমরা? আমার জমি, আমি চষেছি, আমি ধান কেটেছি। সরকারী দলিল আছে।

তোর দলিলে থুথু দিচ্ছি। এ জমি রতীশ গায়েনের। সেই ধান পাবে। সরকারী দলিল। শালা কথায় কথায় সরকারের কথা বলে।

আবার পেটাতে থাকে আজিজকে। আজিজ গোঙ্গাতে গোঙ্গাতে মাটিতে পড়ে গেল। ঐ অবস্থায় তাকে বেঁধে এক পাশে ফেলে রাখল। আজিজ পিপাসায় চিৎকার করছিল। পানি দাও, পানি দাও।

তাকে পানি দিয়েছিল সুবেদার মজুমদার কিন্তু সেই পানীয় যে মানব-মূত্র এটা কল্পনাও করা যায় না। কোন অসভ্য দেশেও যা সম্ভব নয়, তাই সম্ভব করেছিল সুবেদার মজুমদার।

ছোটবেলায় কলকাতায় গিয়েছিলাম মন্মথ রায়ের কারাগার বইটির অভিনয় দেখতে। বন্দীকে শুকিয়ে মারার সেই দৃশ্যটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সে দিন দেশপ্রেমীরা সেই দৃশ্য দেখে উত্তেজনায় ফেটে পড়েছিল। ইংরেজ সরকার বইটির অভিনয় বন্ধ করে দিয়েছিল। অথচ সে দিনের দেশপ্রেমীদের আজ আর দেখা পাওয়া যায় না। আজ কেউ এই অকল্পনীয় অত্যাচারের কাহিনী শুনেও উত্তেজনায় ফেটে পড়ে না।

মনে মনে ভাবলাম, তিরিশ বছর আমি কংগ্রেসের সেবা করেছি। আমার মত লক্ষ লক্ষ লোক কংগ্রেসের পতাকা-তলে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে কিন্তু সেই লড়াই কি করেছিলাম কতকগুলো বর্বরকে পশুর মত ব্যবহার করার স্বাধীনতা দিতে। মনে হয়েছিল আত্মহত্যাই আমাদের উপযুক্ত পথ। আমাদের এই ভারতে কোন স্থান নেই। আমরা ত্যাগের ধর্ম শিখেছিলাম, যারা আমাদের ত্যাগকে পরিহাস করে গদীতে বসেছে তারা ভোগের ধর্ম শেখাচ্ছে। দেশ যে জাহান্নামে যাচ্ছে এটাও তাদের খেয়াল নেই।

আঠার দিন হাজতবাস করে জামিন পেলাম জজসাহেবের দয়াতে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, ডাকাতি, নরহত্যার চেষ্টা, বোমাবাজি এবং বিস্ফোরক দ্রব্য রাখা। আমার বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের অভিযোগ ছিল একশত চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ। তার জন্য দণ্ড হয়েছিল ছয়মাসের কারাবাস। আমি সেদিন আইন

অমান্য করেছিলাম। আনন্দের সঙ্গে দণ্ডভোগ করেছি আর এই স্বাধীন দেশে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হল ডাকাতি, নরহত্যার চেষ্টা ইত্যাদি। এর চেয়ে মিথ্যা অভিযোগ আর কি করা যায় তা জানি না। আমার বয়স এখন সত্তরের কাছাকাছি। আমি বোমাবাজী করেছি এটা বিশ্বাস করার মত বিচারক ভারতে ক'জন আছে জানি না কিন্তু জেলা-জজসাহেব বিশ্বাস করেননি বলেই জামিন পেয়েছিলাম।

জামিন পেলেও মাসে একবার করে আদালতে হাজিরা দিচ্ছি আজও। যাদের এই সব মামলায় জড়িয়ে ছিল তাদের অধিকাংশই হল দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক। তাদের পক্ষে অর্থব্যয় করে আলিপুর আদালতে যাওয়াই অসম্ভব। তাই অনেকে এখনও পালিয়ে আছে।

কি অবিচার বলুন তো। আপনিও তো বয়স্ক লোক। আপনার কি এরকম অভিজ্ঞতা আছে?

আমি নীরবে শুনছিলাম।

ইসুফের ঘুমও ভেঙ্গে গেছে। সেও গা-মোড়া দিয়ে উঠে বসেছে।

আমি আমার মতামত দেবার আগেই বাঁশীবাবুর বাবা বলল, অনেক কথাই বললাম। রাত হয়ে গেছে। রান্নাও শেষ। এবার দয়া করে কিছু মুখে দিন। কাল সকালে আবার কথা হবে।

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে উঠে গেল। তার কথাগুলোর রেশ তখনও আমার কানে বাজছিল। তার অনুশোচনা নেই। এই অভিযোগের প্রতিকার হবে না। কলকাতা থেকে পঞ্চাশ ষাট মাইলের মধ্যে এত বড় নারকীয় ঘটনা যে পুলিশ অফিসার ঘটিয়েছে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছে কিনা জানি না। সরকার নিশ্চয়ই এ বিষয়ে রিপোর্ট পেয়েছে।

সবচেয়ে মর্মান্তিক হল, যে লোকদের ওপর আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার দেওয়া হয়েছিল তারা এভাবে আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে কেবল মাত্র ব্যক্তিগত যে লাভ করেছে সেই লাভের কড়ি দিয়ে উত্তর পুরুষের সর্বনাশের পথ কি উন্মুক্ত করেনি!

বাঁশী পুরকাইত আর ভারতী এল আমাদের ডাকতে।

বসুন, জায়গা হয়েছে, খেতে বসুন।

নিজের মনেই বললাম, চলুন। আপনার বাবার মুখে যা শুনলাম তাতে বুকের রক্ত জমে যাবার উপক্রম। আচ্ছা চলুন।

বাঁশীবাবুর স্ত্রী পরিবেশন করছিলেন।

আমার খাওয়ার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি খাচ্ছেন না কেন দাদা?

বললাম, এই তো খাচ্ছি। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি।

কেন? কিছু খারাপ হয়েছে কি?

না বোন, আপনার শ্বশুরমশায়ের মুখে যে সব ঘটনা শুনলাম তাতে খাবার ইচ্ছাটাই নষ্ট হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে এই অবস্থার জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে আসিনি।

বাঁশীবাবুর স্ত্রী হাসলেন।

বাঁহাতে ঘোমটাটা পেছনে টেনে বললেন, এটা তো একটা দুটো ঘটনা। আরও কত ঘটনা আছে তা আপনার ভাইয়ের কাছে শুনবেন।

বাঁশীবাবু বাধা দিয়ে বলল, ওসব কথা থাক। বুঝলেন দাদা, আপনার বোন এমনটা আমাদের রেঁধে কখনও খাওয়ায় না। আপনারা যদি মাঝে মধ্যে আসেন তা হলে ভোজনটা বেশ পরিপাটি হয়। ছোটবেলা থেকে বোর্ডিং-এ থেকে লেখাপড়া করেছি। বাড়ির রান্নার সঙ্গে পরিচয় ছিল না। ভেবেছিলাম, বিয়ে করলে বউ এসে বেশ রসাল রান্না করে খাওয়াবে। সে গুড়েও বালি। আপনি এসেছেন বলেই শ্রীমতী আজ দ্রৌপদী হয়েছেন। মাঝে মাঝে আসবেন কিন্তু!

বাঁশীবাবুর স্ত্রী বললেন, তা আর দাদাকে বলতে হবে না। বোনের হাতে রান্না খেতে নিশ্চয়ই বছরে একবার আসবেন। তবে আজ তো জোগাড় ছিল না। কাল যাওয়া চলবে না। আজ খাওয়াটা খুব যুৎসই হয়নি। কালকে ভালমন্দ করা যাবে।

আমি মৃদু হেসে খাবারের দিকে মন দিলাম।

তারপরই হতাশভাবে বললেন, কিছুই তো পাওয়া যায় না এখানে বাড়ির তৈরি ঘি আর মুড়ি হল জলখাবার। খেজুরের পাটালি অবশ্য পাবেন। আর বাগানের তরকারি, জমির চাল, পুকুরের মাছ। এগুলোই আমাদের সম্বল। এবার গরুগুলোও শুকনো। মনের মত করে পিঠেপুলি করব তারও উপায় নেই।

আমি বললাম, আমি কিন্তু ভোজনপটু লোক নই। কলকাতায় আমরা পচা আতপ চাল খেয়ে খেয়ে পেটটাকে রোগের ডিপো তৈরি করেছি। তাও যদি পেট ভর্তি খেতে পেতাম তা হলে কোন আপশোষ ছিল না। তাও তো পাচ্ছি

না। আগে এক কেজি চাল পেতাম সপ্তাহে এখন পাই আধ কেজি। দু একদিন এখানে থাকব মনে করছি। অন্তত দুবেলা পেট ভর্তি কয়েক মুঠো ভাত তো পাব। আর সঙ্গে মাছের ঝোল থাকলে বাঙ্গালী জীবনে এর চেয়ে উপাদেয় আহার্য আর কি থাকতে পারে।

এ বছর হয়ত সরু-মোটা মিলিয়ে দু বেলায় ভাত হবে। আসছে বছর কি হবে এখন থেকে সেটাই আমরা ভাবছি।

কেন?

আমাদের তো ভাগ চাষ নেই। নিজেদের চাষ। এবার নাকি আমাদের জমি ছাড়তে হবে। নিজেদের চাষ বন্ধ করে ভাগীদারদের হাতে দিতে হবে।

আপনাদের কি বেশি জমি?

কম জমি বলতে পারেন। আমাদের তিন শরীকের তিয়াত্তর বিঘা জমি। আমাদের অংশে একটু কম। জ্যাঠাশ্বশুরের আর খুড়শ্বশুরের ভাগে আঠাশ বিঘা। আমাদেরও ছিল আঠাশ বিঘা। আপনার ভাই ইলেকশনের সময় এগার বিঘে জমি বিক্রি করেছিল।

আপনাদের সাতাশ বিঘা জমি রয়েছে তা হলে।

হাঁ। তাতে কি এত বড় সংসার চলে। অন্য কোন আয় নেই। আপনার ভাই আবার দু বিঘেতে নিজের হাতে তরকারি চাষ করে। এখানে লঙ্কার চাষ বড় চাষ তাতেই যা কিছু নগদ পয়সা আসে। নইলে ধান বেচলে পেট চলত না। তিন শরীকের জমি এক সঙ্গে চাষ হয়। আমাদের ধান কম হলেও সেটা অপর দুই শরীক পূরণ করে দেয়। আর সারা বছরের তরকারিটা আমরা ওদের জোগাই। এরপর যদি জমি যায় ভাগচাষীদের হাতে তা হলে আমাদের তিনমাসের খোরাকও জুটবে না। শ্বশুরমশায় প্রথম জীবনে খুব দান ধ্যান করতেন, একবার এখানে কলকাতার কোন্ নেতা এসেছিলেন তাকে হাজার টাকা নগদ দিয়েছিলেন কংগ্রেসের কাজের জন্য। তার জন্য বিশ বিঘা জমি বিক্রি করতে হয়েছিল। তখন তো পঞ্চাশ ষাট টাকা দর ছিল জমির। সেই লোককে বুড়ো বয়সে মিথ্যা কারণে পয়সাওলা লোকের ঘুঁষ খেয়ে ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে দিয়েছে। আজও সেই মামলা ঝুলছে।

আমার খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল।

আপনি গল্প শুনছেন, খাচ্ছেন না কেন? উহুঁ, আপনার পেট ভড়েনি। রান্না ভাল হয়নি, তাই না। আমরা চাষার ঘরের মেয়ে, চাষার ঘরের বউ, আমরা

তো শহুরে রান্না করতে জানি না দাদা। ক্ষমা-ঘেন্না করে চেটেপুটে না খেলে আমি আজ অনশন করব কিন্তু।

কোন উত্তর না দিয়ে মৃদু হেসে থালায় যা কিছু ছিল সব চেটেপুটে খেয়ে বললাম, তা হলে আর অনশন করতে হবে না।

সে রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারিনি। বাঁশীবাবুর বাবার ও আজিজের কথা ভেবেছি। এই রকম কাহিনী আরও হয়ত শোনা যাবে লাঞ্ছিত মানুষের মুখে, অথচ আইনরক্ষকরা স্বীকার করবে না কিভাবে আইনের মর্যাদা ধূলিসাৎ করেছে একদল লোভী ব্যক্তির অনাচারে এবং অর্থবানদের শোষণ ও লুণ্ঠন অব্যাহত রাখতে।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হল সুবেদার মজুমদার। সিভিল পুলিসের কোন সুবেদার আছে কিনা জানি না। সশস্ত্র বাহিনীতে সুবেদার হয়ত আছে। তারই একটা নমুনা। বাঁশীবাবু বলেছিল, সুবেদার মজুমদার আর তার সঙ্গীরা রাজার হালে বাস করত এবং ক্যাম্প তুলে দেবার সময় কমপক্ষেও দশ হাজার টাকা পকেটস্থ করে নিয়ে গেছে। টাকা মানুষকে কি ভাবে পশু তৈরি করে তার নিদর্শন আজকাল খুঁজতে হয় না। প্রতি দশজন লোকের নয়জনই টাকার দাসত্ব করে কিন্তু এইভাবে পশুপর্যায়ে কতজন নেমে যায় তা বলা কঠিন। শোনা যায় কলকাতা শহরে নকশাল আন্দোলন দমন করতে কলকাতা পুলিশের জল্লাদ বাহিনী সন্দেহভাজন নকশালদের হত্যা করতে পারলে তিনশত টাকা করে পুরস্কার পেত। কথাটা কতটা সত্যি জানি না, তবে মানুষের মূল্য তিনশত টাকায় নেমেছে ভেবেও উল্লাসবোধ করেছি। যে দেশে শতকরা পঞ্চাশজনের কোন আয় নেই, যে দেশে রাস্তাঘাটে মানুষ অনাহারে মারা যায় সে দেশের মানুষের মাথার মূল্য যদি তিনশত টাকা হয় তা হলে সৌভাগ্য বলতে হবে। সুবেদার মজুমদার এই অনুপাতে এমন কিছু বেশি লাভবান হয়নি।

সারা রাত এদের কথা ভেবেছি।

অথচ একশত বছর আগে এই বাদা অঞ্চলে নিরাপদে পা ফেলতে সাহস পেত না সাধারণ মানুষ। সেদিন যারা জঙ্গল কেটে আবাদ করছিল তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার বদলে বর্তমানে তাদের ওপর যে শোষণ ও পেষণ চলেছে তাতে মনুষ্যত্ব ভূলুণ্ঠিত হয়েছে নিশ্চয়ই। সুধীর মুনডা, আবীর ওঁরাও এদের পূর্বপুরুষ ছোটনাগপুরের জঙ্গল থেকে এসেছিল দু' মুঠো ভাতের আশায়।

তাদের উত্তরপুরুষ যে অনাহারে থাকবে এটা তারা ভাবতেও পারেনি। জঙ্গলের মানুষকে জঙ্গলে আনা হয়েছিল জঙ্গলকে আবাদ করতে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা যা করেছিল তার সাম্রাজ্যের মুনাফা লুটতে সেই ব্যবস্থা আজও কায়েম রয়েছে, স্বাধীন ভারতের জাতীয়তাবাদী সরকার এদের কথা ভাবতেও সময় পায় না। এরা হল কলুর বলদ। ভোটের সময় যারা আসে প্রতিশ্রুতি দেয় তারা ভোট পেলে আর এই পথে পা বাড়ায় না।

পাশে শুয়ে ছিল ইসুফ। তার নাক ডাকার শব্দে মাঝে মাঝে আমার চিন্তার ব্যাঘাত ঘটছিল। মাথাটা কেমন গরম হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠলাম। গিয়ে দাঁড়ালাম বাড়ির উঠোনে। এক পাশে একটা মরা আমগাছ ছিল তারই গুঁড়িতে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আকাশ পরিষ্কার। নক্ষত্ররা মিটিমিটি চেয়ে আছে আমার দিকে। মিষ্টি বাতাসে শীতের আমেজ। রাত এগিয়ে চলেছে। কটা বাজে তা জানি না, খেয়ালও নেই। ঘড়িটা খুলে রেখে এসেছি। দরকার নেই সময় জানার। নিস্তব্ধ এই রাতের সৌন্দর্য আমার ক্লান্ত মনকে সুস্থ করুক। এটাই আমি চাই।

মাথার ওপর দিয়ে রাত্রির এক ঝাঁক পাখী ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে গেল। দূর থেকে নেকড়ের ডাক ভেসে আসছিল। আমি যেমন নিশ্চলভাবে বসেছিলাম সেই রকম ভাবেই বসে রইলাম। আজ কোন কিছুই আমার মনের কোণায় সামান্যতম দাগও কাট ছিল না।

কে যেন এগিয়ে আসছে।

দরজা খোলার শব্দ পেয়েছিলাম। সামনের দালানের দরজা খুলে কে যেন ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। আমার দিকেই এগিয়ে আসছে।

আমি প্রশ্ন করার আগেই মেয়েলি কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কে?

বললাম, আমি। আমি ভারতী।

ভারতী কাছে এগিয়ে-এল। আমার মাথায় ডান হাতখানা রেখে বলল, তুমি এখানে বসে কেন?

বললাম, জানি না। চোখ থেকে কে যেন ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তুমি রাতের বেলায় নির্ভয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছ কেন?

আমার চোখেও ঘুম নেই। রাত জাগলে বার বার বাথরুমে যেতে হয়।

ওঃ, আচ্ছা। যাও শুয়ে পড় গিয়ে।

না। তোমার পাশে বসব। তুমি যেমন আকাশের দিকে মুখ করে বসে

আছ ওমনি ধারা আমিও আকাশের দিকে মুখ করে তোমার পাশে বসে সুন্দর এই আকাশটাকে দেখব।

এবার তুমি কবিত্ব শুরু করলে।

না গো, না। তুমিও বোধ হয় ভাবছ এই বাদার মানুষদের কথা, আমিও ভাবছিলাম। মাথা গরম হয়ে উঠেছে ভাবতে ভাবতে। এত বেশি ভাবতে হবে কোন কালে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

সংসার করনি বলেই ভাবনা নেই। যদি সংসার করতে, তোমার ওপর নির্ভরশীলদের বাঁচাবার দায় থাকত তা হলে ভাবতে ভাবতে শুকিয়ে যেতে। গোপাঙ্গনার মত নিতম্ব দুলিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে পারতে না।

ভারতী গম্ভীরভাবে বলল, সংসার করিনি এটা ঠিক কথা নয়! অন্য সাধারণ মেয়েদের মত সংসার করিনি এটাই বলতে পার। আমার কোন ভাই নেই, পাড়ার ছেলেমেয়েরা আমার মাকে মাসীমা পিসিমা বলে ডাকত। মা খুব খুশী হতেন। বলতেন, বিশ্বজোড়া আমার সন্তানের দল। আমার পুত্র সন্তান না থাকলেও ছেলের অভাব নেই। আমিও তো আজ বিশ্বজোড়া সংসার পেতেছি। নিজের ঘরের দায় দায়িত্ব লাঘব করতে না পারলে বিশ্বের দুঃখী মানুষের দায় দায়িত্বের কথা চিন্তা করতে পারতাম না। ঘরকুনো অন্য সাধারণ মেয়েদের পেছনে ফেলে এইভাবে বনে বাদাড়ে মানুষ খুঁজে বেড়াতে পারতাম কি? এটাই তো আমার সংসার।

আমি কোন মন্তব্য না করে ভারতীর হাতটা কোলের ওপর টেনে নিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

আকাশের রং বদল হতে থাকে।

তারকামণ্ডলী ধীরে ধীরে ঝাপসা হতে থাকে। পুবের আকাশ ক্রমেই লাল হতে থাকে। বড়ই মিষ্টি এই সকালের শীতল বাতাস। দেহটা যেন জুড়িয়ে গেল। এমন সময় ঘুমটা যেন চেপে বসল চোখের ওপর। অথচ আর ঘুমিয়ে থাকার সময় নেই।

চল সকাল হয়ে গেছে।

বললাম, চল নতুন দিনের সন্ধানে। নতুন দিনের আলোতে আরও নতুন কিছু আমাদের জন্য জমায়েত আছে তাকে আবিষ্কার করতে বেরিয়ে পড়ি।

ভারতী ধীরে ধীরে উঠে গেল।

আমিও ফিরে এসে ইসুফের পাশে গা এলিয়ে দিলাম। ঘুমাবো না মনে করেও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বাঁশীবাবুর ডাকে ঘুম ভাঙ্গল।

রাখাল ছেলেটার হাতে চায়ের গেলাস।

আমি চোখ ডলতে ডলতে বললাম, অনেক বেলা হয়ে গেছে।

পল্লীগ্রামে এতো বিশেষ বেলা নয়। উঠে মুখটুকু ধুয়ে চা খান। জলখাবার প্রস্তুত। খেয়ে দেয়ে চলুন দেখতে যাব বাদার আসল চেহারা।

তিনটে বাঁধের পথ এক জায়গায় মিলেছে। ত্রিমোহিনী বলে ওখানকার লোক। ত্রিমোহিনীর কোণায় একটা ঝুপড়ি। সামনে ছেঁড়া চট পেতে একজন মধ্যবয়সী লোক মাছ মারার ছেঁড়া জাল মেরামত করছিল। বাঁশীবাবুকে দেখেই বলল, আমি তোমার কাছে যাব ভেবেছিলাম বাঁশী। তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। বস, আরে শুনছ হরিমতীর মা, একটা বসার কিছু দাও।

ঝুপড়ির ভেতর থেকে হামাগুড়ি দেবার মত করে হরিমতীর মা একখানা ছেঁড়া নোংরা কাঁথা বের করে সামনে হাজির হল। কাঁথাটা পেতে দিল বসতে।

বাঁশীবাবু পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল হরিদাস বৈষ্ণব বাবাজীর পূর্বপুরুষ কোন একসময় খুলনা থেকে এসেছিল। এর বাবাকে ছোটবেলায় আমিও দেখেছি। ঊষাকালে করতাল বাজিয়ে দুয়ারে দুয়ারে নাম সংকীর্তন করত। বাবাজীর মাকে আমরা দেখিনি। শুনেছি অনেক কিছু। সবটা সত্যিও নয়। এর বাবাকে স্থানীয় চাষীরা চাঁদা করে তিন বিঘে জমিও দিয়েছিল। আজ সেই তিন বিঘের এক কাঠাও জমি নেই।

হরিদাস বাবাজী হাতের কাজ রেখে জিজ্ঞেস করল, এদের তো চিনতে পারছি না বাঁশীবাবু। এটা হল বুঝি সেই শঙ্কর নস্করের পরিবার। খুব তেজী মেয়ে। তুমি এখানে কেন?

বেড়াতে এসেছি বাবাজী। আজকাল-তো তোমাকে দেখি না। ভিক্ষেতে যাও না?

যাই কখনও-কখনও। কেউ আর ভিক্ষে দিতে চায় না মা। ভিখিরীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। আগে গরীব চাষীদের ঘরে দু-এক মুঠো চাল পেতাম, আজকাল ওরাই ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে, কে কাকে ভিক্ষে দেয় বল। বড়লোকেদের দরজায় পৌঁছানোও যায় না। কুকুর লেলিয়ে দেয়।

আমরা অবাক হয়ে শুনছিলাম হরিদাস বাবাজীর কথা।

ইসুফ বলল, একটু খাবারজল দাও তো বাবাজী। হরিমতীর মা হামাগুড়ি দিয়ে আবার ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকল। কিছুক্ষণ বাদে হাত বাড়িয়ে একটা কলাইকরা বাটি ভর্তি জল এগিয়ে দিল ইসুফের দিকে।

তা বাবুরা বুঝি দেখতে এসেছ। কি আর দেখবে। সে দিন আর নেই। আগে এখানে তিন পয়সা সের চাল, দু' পয়সা সের দুধ আর বিনা ওজনে গাদা গাদা মাছ ছিল। এখন তো খেতেই পাবে না পেট ভরে। তবে হাঁ, হাটতলায় গেলে চা পাবে। চা খেয়েই খিদে মারতে পারবে।

বললাম, তুমি বাবাজী গাঁয়ের বাইরে দু' হাত উঁচু ঘর বেঁধে এখানে বাস করছ কেন?

ঘর তো আমার ছিল ঝুপতলীর শেষ সীমানায়। ভোটের বাজারে ঘর আমার খোয়া গেছে। আমি গাঁয়ে গাঁয়ে নাম কীর্তন করতে যেতাম, লোকেদের বলতাম ভোট কাকে দিতে হবে। এই অপরাধে আমার ঘর গেছে বাবু। যার কথা বলতাম, সে হেরে গেছে। হেরে যাবার পরদিন রাতেই পুড়েছে আমার ঘর। শুধু আমার ঘর নয় বাবু, যারা একটু বেশি নড়াচড়া করেছিল তাদের ধরে ধরে পিটিয়েছে, তাদের ঘরে আগুন দিয়েছে। আমি আর কি করি। এই জমিটা হল বেনামী জমি। এরই বার হাত জমিতে এই ঘর তুলেছি। ঘর ছাওয়ার খড় পাইনি। বাঁশীবাবু কিছু খড় দিয়েছিল, তালপাতা দিয়ে ছেয়েছি। আমরা দুজন বোষ্টুম-বোষ্টুমি, আমাদের আর ভয় কি! হরিনাম করি, যা জোটে তাই খাই। যেদিন থাকে না সেদিন নারায়ণের নাম স্মরণ করে শুয়ে পড়ি।

ভিক্ষাই তোমার জীবিকা?

ভিক্ষায় কি পেট ভরে বাবু। আমি হাতের কাজ জানি। ঘরামির কাজ কবি। কখনও কখনও জোয়ারের জলে জাল মেরে মাছ ধরি। এতেই কোন রকমে চলে যায়। আগে রিলিফের ভুট্টা কিছু কিছু পেতাম। এই সব কুড়িয়ে কোন রকমে পেটটা ভরে। হরিমতীর মা চাষীদের বাড়িতে মাঝে মাঝে ধান সেদ্ধ করে, ধান ভানে তাতেও কিছু পাই। এই নিয়েই আমাদের জীবন।

তোমাদের কি আর কোন আশা নেই?

অনেক আশাই তো থাকে মানুষের, কোনটা পূরণ হয় বলতে পারেন? এখন একটাই আশা, শ্রীহরি নাম করতে করতে ভবযন্ত্রণা থেকে যেন মুক্তি পাই।

মরণেই কি তোমার আশা পূর্ণ হবে?

জন্মালেই তো মরতে হবে বাবু। তাতে যদি আশা পূর্ণ হত তা হলে বেঁচে থাকার জ্বালা-যন্ত্রণা কি কেউ সহ্য করতে চাইত, জন্ম মাত্রই মৃত্যুকে ডেকে নিত। তা যখন হয় না, আশাও পূর্ণ হয় না তখন অপেক্ষা করতে হয় যাতে মৃত্যুটা সময়মত আসে এবং শ্রীহরির চরণে আশ্রয় পাই।

ইতিমধ্যে হরিমতীর মা ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। আধখানা শাড়ি দিয়ে দেহের নিম্নাঙ্গ ঢাকা, উর্ধাঙ্গে একটা ছেঁড়া গামছার আচ্ছাদন। বয়স পঁয়ত্রিশের মধ্যেই মনে হল, তার শীর্ণ দেহ পুষ্টির অভাবে বয়স ঠিক করার মত নয়। তবুও তার উন্নত বক্ষদেশ ও ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম তার বয়সের একটা পরিমাপ বুঝিয়ে দিচ্ছিল। এতক্ষণ সে চুপ করেই ছিল। বাবাজীর কথা শেষ হতেই হরিমতী বলল, আমি কিন্তু অতশত বুঝি না। মরণেই যদি শ্রীহরি প্রাপ্তি তা হলে এমন কষ্টটা না করে নিমগাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়লেই পার। তা নয় বাবু। আমরা কিছুই পারি না, তাই যা পাই তাতেই খুশী হই। আমরা চাইতেও জানি না। যদি চাই তা আদায় করতে জানি না। যা আদায় হয় তা ভোগ করতে পারি না। দোষটা কার বলুন। যে পেয়েও হারায় তাকে দোষ দেওয়া যায়। কিন্তু যে পাওয়ার চেষ্টায় প্রাণপাত করে তার দোষটা কোথায় বলুন। নারায়ণ জানে, আমরা চেষ্টা করি কিন্তু পাই না।

হরিমতীর মায়ের বক্তব্য থেমে গেল। সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তশীলদারের পিওন আবু হোসেন। তাকে দেখেই হরিদাস বাবাজী বলল, কোথায় যাচ্ছ হোসেন মিঞা?

হোসেন মুখ ঘুরিয়ে বলল, এবার আবার মধু সংগ্রহে যাব ঠিক করেছি। যাচ্ছি সাত নম্বরে আর তিন নম্বরে। জোসেফ নস্কর, সেলিম পাটোয়ার, খুদু ঢালিও যেতে চেয়েছে। তাদের সঙ্গে কথা বলে রফা করতে যাচ্ছি। তুমি যে এখনও বাড়িতে বসে আছ, ভিক্ষেয় বের হও নি।

বের হলেই তো ঝোলা ভর্তি হয় না। যারা ভিক্ষে দিত তারাই ভিক্ষে করছে। ঝোলায় দানা পড়ে না।

ঠিক বলেছ বাবাজী। আমরা কি সখ করে বনে যাই। জানটা হাতে নিয়েই যেতে হয়। দশজন গেলে নয়জনের বেশি ঘরে ফেরে না, তা তো সবাই জানো। এবার যা অবস্থা দেখছি, মধু বেচে কিছু না আনতে পারলে না খেয়েই থাকতে হবে বাবাজী। মরতে যদি হয় তা হলে মরদের মত বাঘের সঙ্গে লড়াই করেই মরব। না খেয়ে শুকিয়ে মরব না।

যা বলেছিস হোসেন। তোর বয়স আছে। আমার তো বয়স নেই। বয়স থাকলে এ বছর তোদের সঙ্গে যেতাম। আমার বোষ্টুমি কি বলে জানিস? বোষ্টুমি বলে, আমরা তো আর মানুষ নই, জানোয়ার। কেমন হামাগুড়ি দিয়ে ঝুপড়িতে ঢুকি আবার বের হই। আমরাও চার পায়ে হাঁটি চলি, জানোয়াররাও চার পায়ে হাঁটে চলে। ফারাক নেই। তার চেয়ে চল বাইশ নম্বরের ঝাউখালির চরে। বাঘে মানুষে সমান হই।

বেশ কিছু যেন রসিকতা মনে করে হোসেন হাসতে থাকে।

হাসিস না হোসেন ভাই। সত্যিই আমরা জানোয়ার হয়ে গেছি। বোষ্টুমি কিন্তু মাঝে মধ্যে হক্ কথা কয়। কি কও বাঁশীবাবু। ঠিক কথা কি না?

বাঁশীবাবু মৃদু হেসে বলল, ঠিক কথা তবুও আমাদের মানুষের মত বাঁচতে হবে বাবাজী। নিত্যকার এই কষ্ট সহ্য করে ভগবানের পাদপদ্মে মাথা রেখে কাঁদলে তো পেট ভড়বে না। সেই একটা গল্প আছে, এক সময় একটা সাপ ব্রহ্মার কাছে আবেদন জানাল, প্রভু, আমাকে দেখলেই মানবজাতি লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে। আপনি আমাকে বাঁচান। ব্রহ্মা বললেন, দেখ বাপু, তুমি অতিশয় খল। তোমাকে এইভাবে মারাটা অন্যায়, তবুও তোমার খল স্বভাব যতদিন থাকবে ততদিন মানবজাতি তোমাকে মারবেই। সাপ বলল, আমি কি করব প্রভু? ব্রহ্মা বললেন, তুমি খল স্বভাব পরিত্যাগ কর। সাপ ব্রহ্মার উপদেশ মত খল স্বভাব পরিত্যাগ করে রাস্তার ধারে শুয়ে থাকত। লোকে তাকে ওভাবে শুয়ে থাকতে দেখে লাঠি দিয়ে একবার খোঁচা দিত যাতায়াতের সময়। লাঠির খোঁচায় সাপের দেহে ক্ষত সৃষ্টি হল। সাপ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ব্রহ্মার কাছে গেল। বলল, সব ঘটনা। বলল, বলুন প্রভু এবার কি করব? ব্রহ্মা ক্রোধের সঙ্গে বলল, তোমাকে খল স্বভাব পরিত্যাগ করতে বলেছি, কিন্তু ফোঁস-ফোঁস করতে তো নিষেধ করিনি। এবার কেউ আঘাত করতে এলেই ফণা উঁচিয়ে ফোঁস-ফোঁস করবে তা হলে ভয়েই ওরা পালাবে, কাউকে দংশন করতে হবে না। আত্মরক্ষার জন্য ফোঁস-ফোঁস করতে হয় বাবাজী। অত্যাচার মেনে নিলে সারাদেহ ক্ষতবিক্ষত হবে, অথচ পেট ভড়বে না।

বাবাজী হেসে বলল, ঠিক বলেছ বাঁশীবাবু। বাঁচতে হলে পড়ে পড়ে মার খাওয়া চলবে না।

হোসেন কয়েক পা এগিয়ে যেতে যেতে বলল, যা বলেছেন বাঁশীবাবু,

মরদের মত লড়াই করে মরাই ভাল। আত্মরক্ষা করতে হলে আত্মদান করতে হয়। আমরা তাই করব।

হোসেন বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল।

জয়াবতী বলল, এবার চল বাঁশীদা। আরও অনেক জায়গাতে যেতে হবে।

হাঁ চল। তা হলে চলি বাবাজী।

আবার এস কিন্তু, আসল কথা বলাই হল না। একটু নিরিবিলি শুনতে হবে। আমিই যাব তোমার কাছে।

আমরা বাবাজীর ঝুপড়ি পেছনে রেখে এগিয়ে চললাম নদীর দিকে।

নদীর কিনারায় হাটতলা।

চলতে চলতে ভারতী জিজ্ঞেস করল, এবকম ঝুপড়ি তো অনেক দেখেছি। এ সবের বাসিন্দা কোথায়?

বাসিন্দাদের একটা অংশ পাবেন কলকাতার ফুটপাতে, আরেকটা অংশ মরে ফৌত হয়েছে না খেয়ে, আরেকটা অংশ ধুঁকতে ধুঁকতে ঘুরছে ফিরছে কেউ মজুরী পাবার আশায়, কেউ ভিক্ষার আশায় আবার দু'একজন আছে যারা ডাকাতি চুরির ধান্দায় ঘুরছে।

বাঁশীবাবু সামনে চলছে বেশ জোরে জোরে পা ফেলে। কিছুটা যাবার পর ডান দিকে একটা পাকা দোতলা বাড়ির দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, এটা হল একটা বড় মুসলমান জোতদারের বাড়ি। আর ঐ দেখুন দূরে নারকোল গাছের পেছনে একটা পাকা দোতলা বাড়ি। ওটাও আরেক জন মুসলমান জোতদারের বাড়ি। এই বাড়ির মালিক আয়েনুদ্দির জোতজমা বেশি, স্বনামে-বেনামে অন্তত তিনশ বিঘে জমি। আর ঐ বাড়ির মালিক আলি তালেবের অবস্থাও ভাল, তবে আয়েনুদ্দির মত অবস্থা নয়। দুজনের খুব রেশারেশি। দুজনেরই জমির ক্ষুধা প্রচণ্ড। দুজনেই গরীব চাষীদের দু'চার বিঘে জমি ফন্দী-ফিকির করে হস্তগত করে বেশ গরম মেজাজে বাস করত। এদের অত্যাচারে গ্রামের বহু গরীব চাষী গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে। মুসলমান সমাজে ওদের হুকুম যেন আল্লার হুকুম।

বাঁশীবাবু কিছুক্ষণ থেমে থাকার পর বলল, আয়েন আর তালেবের রেশারেশির কথা জানে এই গ্রামের সব মানুষ। ঘটনার মোড় ঘুরল। আয়েন খবর পেল তালেব দ্বিতীয় বার বিয়ে করে এনেছে মথুরাপুর থেকে। এই বউ খুব সুন্দরী আর স্বাস্থ্যবতী। এবার আয়েন তার অনুচরদের পাঠালো তালেবের চেয়ে একটা সুন্দরী বউ জোগাড় করতে। যারাই শুনল আয়েনের তিনটে বউ

জীবিত তারাই পিছিয়ে যেতে থাকে। আয়েন তো হার মানবার লোক নয়। বলল, যত টাকা লাগে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী বউ তার চাই।

ছুটল অনুচররা। নানা জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসে কিন্তু কোন মেয়েই তার পছন্দ হয় না।

শেষে তার পারিষদ বলল, বড়মিঞা বেরথা এই খোঁজাখুঁজি। তালেবের বউটা বাগিয়ে আনতে পারলে সব চেয়ে ভাল হয়। মোহরাণ পঞ্চাশ বিঘে জমি দিলেই হতে পারে।

কিন্তু তালেব তো তালাক দেবে না।

খুলা নিতে হবে। ঝগড়া বাধিয়ে মেয়েটাকে বিগরে দিতে পারলেই কাজ খতম। কোন রকমে মেয়েটাকে বাপের বাড়ি পাঠাতে হবে।

আয়েনুদ্দি চিন্তিতভাবে বলল, কাজটা খুব সহজ নয় রহিম। তবে চেষ্টা করতে পার।

রহিম মিঞা তালেবের ঝি-চাকরাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ করল। তাদের টাকা খাওয়ালো কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। ময়না বিবি পাত্তাই দিল না কাউকে। বরং অপমান করে দুটো চাকরাণীকে তাড়িয়ে দিল।

সংবাদ পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল আয়েনুদ্দি।

এরপর চলল শলা পরামর্শ।

এর ফল দেখা গেল হাতে হাতে।

তালেব মিঞা সকালবেলায় জমি দেখতে যায় ধান পাকার সময়। সুযোগ পেল আয়েনুদ্দির গুণ্ডারা। একদিন সকালে তালেব মাঠের আইল ধরে যাচ্ছিল এমন সময় চারদিক থেকে ঘিরে ধরল আয়েনুদ্দির গুণ্ডারা। এককোপে তালেবের মাথা ধড় থেকে আলাদা করে ফেলল। বিজয়ীর মত হত্যাকারীরা তালেবের মাথা বর্শার মাথায় গেঁথে নিয়ে গেল আয়েনুদ্দিকে ভেট দিতে। গ্রামের মানুষ বোকার মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, কেউ কিছু বলতে সাহস পেল না। এমন কি থানায় খবর দিতেও সাহস পেল না।

তালেবের বাড়িতে কান্নাকাটি। তারা সবই শুনেছে। তারাই গেল থানায়। তিনদিন পরে পুলিশ এল। পুলিশ আসার খবর পেয়ে গুণ্ডারা গা ঢাকা দিয়েছিল। আয়েনুদ্দির বাড়িতে এসে উঠল পুলিশ দারোগা। ফিস্-ফিসানি কি সব হল তা কেউ জানে না। দারোগা পুলিশ পেট মোটা করে ফিরে গেল। আসামী একজনও গ্রেপ্তার হল না।

আয়েনুদ্দির আশাপূরণ হল না কিন্তু! ময়নাবিবি চলে গেল তার বাপের বাড়িতে। আয়েনুদ্দির অনুচররা গেল ময়নাবিবির বাবার কাছে। নগদ টাকা পয়সা দিল যাতে আয়েনের সঙ্গে ময়নার নিকা হয়। নানাভাবে বিশেষ চেষ্টা করতে থাকে। ময়নাবিবির বাবা রাজী হলেও ময়না কিছুতেই রাজী হল না।

ময়নাবিবি বাপের বাড়িতে এসে পাশের বাড়ির খলিলকে দিয়ে দরখাস্ত লিখিয়ে পাঠিয়ে দিল সরকারী দপ্তরে। এতদিনে ধামা চাপা পড়ে গেছে সেই খুনের ঘটনা। খতেমি রিপোর্ট পেয়ে আদালতও মামলা নথিভুক্ত করেছে।

সরকারী দপ্তরের দরখাস্ত মন্ত্রীর হাতের ছোঁয়া পেতেই ঘটনার গতি বদলে গেল। মন্ত্রীর আদেশে গোয়েন্দা বিভাগ তদন্ত করতে থাকে। হঠাৎ এক রাতে বিরাট এক পুলিশ বাহিনী এসে ঘিরে ফেলল আয়েনুদ্দির বাড়ি। ঘরবাড়ি সার্চ করার পর আয়েনুদ্দি ও তার কয়েকজন সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করল।

মামলা চলল প্রায় দু বছর। বিচারে আয়েনুদ্দির আট বছর কারাবাসের আদেশ হয়েছিল। এখনও সে জেলখানায় আছে। মামলা চলাকালে একবার জামিন পেয়ে পাকিস্থানে পালাবার চেষ্টাও করেছিল। ভেস্তে দিয়েছিল গোয়েন্দা বিভাগ।

তালেবও মরল, আয়েনুদ্দিও জেলে, শুনেছি ময়নাবিবিকে বিয়ে করেছে কুলপীর কোন্ অর্থবান মুসলমান জোতদার।

জমির ক্ষুধা আর নারীর ক্ষুধা কিভাবে মানুষকে বিপথে নিয়ে যায় তারই এটা একটা দৃষ্টান্ত। এটা মুসলমান ঘরের কথাই নয়, এমন ঘটনা হিন্দুদের ঘরেও হচ্ছে।

বললাম, জমির ক্ষুধা, নারীদেহের প্রতি লোলুপতা হল অসম সমাজব্যবস্থার পাপ। সমাজে যতদিন সাম্য না আসে, ভূমি যতদিন সমাজের অধিকারে না আসে, ততদিন মানুষে মানুষে তারতম্য থাকবে। যতদিন শ্রেণী বিভেদ থাকবে ততদিন এ পাপ থেকে কেউ মুক্ত হতে পারবে না। ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিতে চায় সমাজের স্বার্থে এমন মানুষ যতদিন না সমাজকে পরিচালনা করবে ততদিন আয়েন-তালেব নাটকের অভিনয় হামেশাই দেখতে পাবেন।

কথা বলতে বলতে একটা খালের ধারে এসে দাঁড়িয়ে গেলাম।

বাঁশের সাঁকো দিয়ে ধীরে ধীরে একজন একজন করে খাল পেরিয়ে হাটতলায় উঠলাম।

ছোট হাট। খড় বিক্রির হাট। বড় বড় নৌকা আসে গঞ্জের ঘাটে। খড় বোঝাই হয় সেই সব নৌকায়। নদীপথ বেয়ে সমুদ্রের মোহনা দিয়ে এই সব নৌকা যায় কলকাতায়। খড়ের আড়তদাররা কয়েকটা গুদাম রেখেছে, হাটের এপাশে ওপাশে আছে খড়ের বিরাট বিরাট গাদা, একটা গাদাতো সুউচ্চ মন্দিরের মত মনে হল। কিছু কাঠও চালান যায় এখান থেকে। নদীর কিনারায় হাট, জোয়ারের সময় নৌকাগুলো হাটের ঘাটেই জমা হয়। তখন নৌকা বোঝাই দেয়। বোঝাই দিতে দিতে ভাটার টান পড়লে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে নৌকাগুলো। পরবর্তী জোয়ার আসার আগেই নৌকা বোঝাই করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই সব ক্রেতা পাইকারদের জন্যই বোধহয় কোন সময় এখানে দু-একটা দোকান বসেছিল, সেটাই এখন ছোটখাট হাট হয়েছে।

সেদিন হাটবার নয়। হাটতলা ফাঁকা। কতকগুলো নৌকা কাদায় দাঁড়িয়ে, মজুররা নৌকা বোঝাই দিচ্ছে। ভাটার টানে নদীর জল নেমে গেছে তিরিশ ফুটের বেশি দূরে। কয়েকটি দোকান তখনও খোলা। তার মধ্যে একটা দর্জির দোকান, আর কয়েকটা চা সহ হোয়াট-নট্ বিক্রির দোকান।

বাঁশীবাবু বলল, কিছু খেয়ে নিন। এক কাপ চা আর মুড়ি বাতাসা।

বললাম, খেয়েই তো বেড়িয়েছি। আর দরকার নেই। ঠাণ্ডা জল দু'এক গ্লাস পেলে ভাল হত।

জল পাবেন, চা-ও পাবেন। দুটোই খেয়ে নিন।

আমি অন্যমনস্কভাবে দেখছিলাম একটা সতেজ লাউগাছকে। চায়ের দোকানের চালটা ঘিরে রেখেছে। কতকগুলো কচি লাউ গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে খড়ের চালে। মনে হচ্ছিল, মায়ের কোলে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে কয়েকটা শিশু। এদের ঘুম ভাঙ্গাবার সময় এখনও হয়নি, তাই ওরা নিরাপদ। লাউগাছটাও বেশ রসিক। আশ্রয়কে কেমন সুন্দর আঁকড়ে ধরে রয়েছে। কোন প্রণয়িনী যেন প্রণয়ীর বুকে মাথা রেখে জাপটে ধরেছে।

বাঁশীবাবুর কথাগুলো কানে বোধহয় প্রবেশ করেনি। অন্যমনস্ক ভাবে বললাম, এক গ্লাস জল দিন তো।

জল পেলাম। ততক্ষণে প্রাইমাস স্টোভ ধরিয়ে দোকানদার চায়ের জল তুলে দিয়েছে।

বাঁশীবাবু বলল, জটার দেউল নাম শুনেছেন তো?

মাথা নেড়ে বললাম, হাঁ।

ঐ দেখুন জটার দেউল।

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম। বেশ কয়েক মাইল দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই সুউচ্চ দেউল, অথচ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

এর কোন ইতিহাস নিশ্চয়ই আছে।

হয়ত আছে। আমরা জানি না। কেউ বলে সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের জন্য ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে বাতিঘর ছিল যাতে জাহাজের দিক্‌নির্ণয়ের কোন অসুবিধা না হয়। আবার কেউ বলে, ওটা শিবের মন্দির। অবশ্য একটি শিবলিঙ্গ আছে ওখানে। মন্দির দেখলে বুঝতে পারবেন, আসলে ওটা কি। আমার মনে হয় ওটা শিবমন্দির নয়।

ভারতীর হাতে চায়ের গ্লাস তুলে দিতেই জয়াবতী বলল, জটার দেউলের একটা মজার গল্প আছে।

ভারতী বলল, কি সেই গল্প!

কোন এক চৌধুরীর জমিদারীর অন্তর্গত ছিল এই জটার দেউল। সেই চৌধুরী জমিদাররা বাঙ্গালী নয়। পাঞ্জাব থেকে কোন সময় এসে ইংরেজ সরকারকে ভেট দিয়ে জমিদারী পেয়েছিল।

জমিদার ছিল প্রবল প্রতাপান্বিত আর উৎকৃষ্ট মদ্যপ। সে যেখানে যেত সঙ্গে যেত একদল পারিষদ আর বন্দুক এবং কয়েকটি সুশিক্ষিত অ্যালসেশিয়ান কুকুর।

একবার জমিদারের খেয়াল হল জটার দেউলের মাথায় কি আছে তা দেখার। লোক প্রবাদ হল জটার দেউলের মাথায় সোনার কলসী আছে। জমিদার প্রভু বোধহয় সোনার কলসীটা হস্তগত করতে চেয়েছিল।

একদিন সপারিষদ জমিদার গেল জটার দেউলে।

বলল, আমি দেউলের মাথায় উঠব।

পারিষদরা বলল, না হুজুর ও কাজ করবেন না। এমন কাজ আজ পর্যন্ত কেউ করতে সাহস পায়নি। যারা উপরে উঠেছে তারা আর নামতে পারেনি। মহাদেবের অভিশাপ আছে। আর উঠবেনই বা কি করে? মন্দিরের দেওয়ালে লোহার রিং আছে ঠিকই, তবে অনেকগুলো ভেঙ্গে গেছে, অনেকগুলো মরচে ধরে নষ্ট হয়ে গেছে। তার ওপর সোজাসুজি উঠবার কোন উপায় নেই। এঁকেবেঁকে উঠতে হবে। আপনার বয়স হয়েছে বিপদ হবে।

চোখ পাকিয়ে জমিদার বলল, কেরে বেটা, রতা নাপতে বুঝি? শালা আমি বুঝি তোদের মত বাঙ্গালীর বাচ্চা। আমি পাঞ্জাবী তা জানিস। আমাদের পূর্ব পুরুষরা কত লড়াই করেছে জানিস? আমি উঠবই। কথা শেষ করেই জমিদার প্রভু লোহার রিং ধরে উপরে উঠতে লাগল। অনেক কসরৎ করে এঁকেবেঁকে প্রায় এক ঘণ্টায় জমিদার তো উঠল দেউলের মাথায়। সোনার কলসী খুঁজে পেল না। এবার ফিরতি পথ ধরল।

এতক্ষণ তো খেয়াল ও দম্ভের পরীক্ষা হয়েছে। উপরে উঠে নিচে তাকিয়েই জমিদারের মাথা ঘুরে গেল। তার ওপর নামার কোন সহজ পথ নেই। এর মধ্যে মদের নেশা ফিকে হয়ে গেছে। নামবার পথ বন্ধ দেখেই জমিদার চিৎকার করতে লাগল, আমাকে শীগ্‌গীর নামা।

কে নামাবে। কেউ সাহস করে উপরে উঠলেও নামাতে হলে শক্ত মোটা যে পরিমাণ দড়ির প্রয়োজন তা কোথায় পাবে।

পারিষদরা মাথায় হাত দিয়ে বসল।

শলা পরামর্শ হল কিন্তু নামাবার কোন ব্যবস্থাই করা গেল না।

সেদিন এই দলের সঙ্গে ছিল জমিদারের আঠার বছর বয়সের পুত্র। তার মাথায় তখন বাজ ভেঙ্গে পড়েছে। তার বাবা আটক, অথচ করার কিছু নেই।

রতা নাপতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, আমি নামাতে পারি।

বেশ নামাও। তোমাকে দুশ টাকা বকশীশ দেব।

রতা বলল, উহুঁ, তাতে হবে না। আরও চাই।

পাঁচশ দেব।

উহুঁ, টাকা চাই না। আমার জন্য একটা কাজ করতে হবে ছোট হুজুর।

কি কাজ?

বড় হুজুর নিচে নেমেই আমাকে গুলি করতে আসবে, তখন আমাকে বাঁচাতে হবে। তিন সত্যি করুন। তা হলে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

বেশ, আমি তোমার জীবনের দায়িত্ব নিলাম।

রতা বার তিনেক জটার দেউলটা বেড় দিয়ে অতি অশ্রাব্য ও কুৎসিত ভাষায় জমিদারকে গালাগালি করতে লাগল। এমনই অশ্রাব্য অশ্লীল সেই গালাগালি যা শুনে অপরাপর পারিষদরা পর্যন্ত থ' হয়ে গেল। মাতৃকুল-পিতৃকুলকে নিরয়গামী করে কোন একজন পারিষদ যে দুর্দান্ত জমিদারকে

গালাগাল করতে পারে তা অন্যান্য সঙ্গীরা কল্পনাও করতে পারে নি। রতা নাপিত জটার দেউল প্রদক্ষিণ করতে করতে অনবরত অবিশ্রান্তভাবে জমিদারকে গালাগাল করছিল উচ্চস্বরে।

ফলাফল হাতে হাতে পাওয়া গেল। চৌধুরী জমিদারকে দেখা গেল লোহার রিং ধরে বেশ দ্রুততার সঙ্গে নেমে আসছে। এবার সবাই বুঝল, জমিদার তার মর্যাদাহানি সহ্য করতে না পেরে অত্যধিক ক্রোধে ও উত্তেজনায় জটার দেউলের শীর্ষ থেকে নির্ভয়ে নেমে আসছে। এই উত্তেজনা সৃষ্টি করতেই রতা নাপিত অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করছিল। যতই জমিদার নিচের দিকে নেমে আসছিল ততই রতার গালাগালির সুরও অশ্রাব্য হয়ে উঠছিল। যে স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল দেউলের মাথায় উঠে, উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সেই দুর্বলতা কেটে যাওয়াতে অনেকটা অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল জমিদার।

মাটিতে পা দিয়েই বলল, আমার রাইফেল। শালা নাপতেকে আমি শেষ করব।

রতা তখন পালাচ্ছে।

জমিদার রাইফেলে গুলি ভড়বার আগেই তার ছেলে এসে ঘটনাটা বলতেই সব ঠাণ্ডা। জমিদার হতাশার সুরে বলল, শালা নাপিতের তো খুব বুদ্ধি। সত্যি যদি উত্তেজনা সৃষ্টি না হত তা হলে আমি ওখান থেকে নামতেই পারতাম না। এই শালা রতা, এদিকে আয়।

রতা যেন প্রাণ ফিরে পেল। ছুটে এসে জমিদারের পা চেপে ধরে বলল, এবারকার মত ক্ষমা করুন হুজুর। আপনার প্রাণ বাঁচাতে আমার প্রাণ বিপন্ন করেই এই কাজ করেছি।

বেশ করেছিস শালা। তোর বুদ্ধির তারিফ করছি। চল, তোর নামে পাঁচ বিঘে জমি লিখে দেব আজকেই।

হুজুরের দয়া। হুজুর মা-বাপ। যেমন করবেন তেমন হবে। যেমন বলবেন তেমন করব।

বললাম, জয়া, তুমি এই সব আষাঢ়ে গল্প কোথায় শুনলে?

আষাঢ়ে গল্প নয়! হয়ত কিছু বাড়াবাড়ি করেছি কিন্তু ঘটনাটা সত্য।

ভারতী জিজ্ঞাসা করল, এই নদী পেরিয়ে ওপারে কোথায় যাওয়া যায়?

এই নদীর ওপারে তিন মাইল গেলেই বড় একটা নদী। সেটা পেরোলেই বাইশ নম্বর ফরেস্ট। সেই যে ঝাড়খালির দ্বীপ। সেই ঝাড়খালি যেখানে সুন্দর আর সুন্দরী বাঘ নিয়ে সরকারের মাথা ব্যথা, দেহে ব্যথা, প্রাণে ব্যথা জেগেছিল। ঝাড়খালির এপারের মানুষের জন্য সরকার পয়সা ব্যয় করতে অপারগ অথচ বনের বাঘের জন্য কত না দরদ! আমরা সুন্দরবনের গভীরে বাঘ-কুমীর অঞ্চল থেকে পাঁচ ছয় মাইল দূরে আছি।

ভারতী জিজ্ঞেস করল, বাঘ আপনাদের এদিকে আসে না বাঁশীবাবু?

বাঁশীবাবু বলল, আমার যতদিন জ্ঞান হয়েছে ততদিন এপারে বাঘ এসেছে বলে শুনিনি। বাঘ বলতে আমি বলছি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। তবে মেছো বাঘ, নেকড়ে, ভামোট এদের উৎপাত মাঝে মাঝে হয়।

আমরা কিন্তু ঐ বড় নদীটার কিনারায় যাব মনে করেছি।

আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আজই খবর পাঠাতে হবে।

খবর না দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় কি?

সম্ভব। তবে যেখানেই আপনারা যাবেন সেখানে অন্তত ভদ্র ও নিরাপদ আশ্রয় দরকার। গরীব মানুষরা আপনাদের পোলাও কালিয়া দিতে পারবে না, সময়মত দুটো নুন ভাত যাতে দিতে পারে সেই ব্যবস্থাটা অবশ্য করতে হবে। দাদা যদি একা হতেন তাহলে আপত্তি ছিল না। মেয়েদের কোথাও যেতে হলে মর্যাদার প্রশ্ন থাকে। কাল সকালে নদী পেরিয়ে ওপারে যেতে পারবেন। আজই আমি সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

বাঘ দেখতে পাব কি?

রিজার্ভ ফরেস্টে না গেলে বাঘ হরিণ কিছুই দেখতে পাবেন না। বাঘ তো আমাদের নিকট প্রতিবেশী কিন্তু বন্ধু ভাবাপন্ন নয়। বাঘও আমাদের ভয় করে, আমরাও বাঘকে ভয় করি। সম্পর্কটা যে মধুব নয তাতো বুঝছেন, সেজন্য উভয়পক্ষই নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে চলতে অভ্যস্ত।

হাঁটতে হাঁটতে নোনা জলের বাঁধের ওপর হাজির হতেই জয়াবতী মুখর হয়ে উঠল।

এই বাঁধ জোয়ারে আর বন্যায় বহুবার ভেঙ্গেছে। সরকার মেরামতের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করেছে, টাকাটা ঠিকাদারের পকেটে গেছে কিন্তু বাঁধ মেরামত কোন বারই ভাল করে হয়নি। আগের দিনে প্রজা শায়েস্তা করতে জমিদাররা এই বাঁধগুলো কেটে নোনা জল ঢুকিয়ে দিত প্রজার জমিতে। একবার নোনা

জল ঢুকলে তিন বছর ফসল পাওয়ার আর আশা থাকে না। প্রজা শুকিয়ে মরে। এখনও অনেক জোতদার এই জঘন্য উপায়ে ভাগচাষী তাড়াচ্ছে, প্রতিবিধান হচ্ছে না। এ বাদেও নোনা জল ঢুকিয়ে দিয়ে কিছুকাল জমি জলের তলায় রেখে শেষে সেটাকে মাছের ভেড়িতে পরিণত করেছে। যার জমি সে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। অন্যায় করে এইভাবে জমি দখল হল সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের বিশেষত্ব। এরকম ভেড়ি অনেক দেখতে পাবেন নদীর ওপারে।

আমরা ফিরতি পথ ধরলাম। আমার পাশাপাশি চলছিল বাঁশীবাবু।

বাঁশীবাবু বলল, সুন্দরবনের জমি নতুন জমি। বন্যা আর খরা না হলে স্বাভাবিক অবস্থায় জমিতে সোনার ফসল হয়। সেজন্য জমি দখলের নেশা পেয়ে বসেছে অনেকেরই। জমির দখল নিতে কত যে খুন জখম হয়েছে তার হিসেবই নেই। জমি কার, এই প্রশ্নের জবাব আজও পাওয়া যায়নি। তাই জমির ফসলের কে অধিকারী তারও কোন সীমা নির্ধারিত হয়নি। লাটদার জমিদার আর নেই। কিন্তু তাদের বেনামে রয়েছে বড় বড় জোতদার। গোটা সুন্দরবন অঞ্চল দেখলে বুঝতে পারবেন, এখানকার শতকরা আশীজনের কোন জমি নেই, এমন কি বাস্তু জমিও নেই অনেকের। শতকরা আঠাশজনের কোন রকমে অন্ন সংস্থান হয়। বাকি শতকরা দুইজনেব ঘরে হাজার হাজার মণ ধান পাবেন। এরা এই ধানের কারবারে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছে। আর এদেরই পাশে হাজার হাজার মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করছে।

বললাম, আমার সঙ্গে অসীম হালদারের পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন?

পারি। তাতে কোন লাভ হবে কি!

লাভ নেই ঠিকই তবে এই সব শোষক-জোতদারের আসল চরিত্রটা জানা যেতে পারে। আরও একটা কথা ভেবেছি, যারা সামান্য অর্থের বিনিময়ে এইসব জোতদারদের পক্ষ অবলম্বন করে দাঙ্গা হাঙ্গামা করে, লুটতরাজ করে, নারীর অমর্যাদা করে, তারা তো জোতদার নয়। তাদের নৈতিকতাটাও জানা দরকার মনে করি।

বাঁশীবাবু বলল, সবই জানতে পারবেন, আপনার সঙ্গে অসীম হালদারের পরিচয় করাতে হলে আমাকেই যেতে হবে।

আপনি তো তার শত্রুপক্ষ।

শত্রুপক্ষ যদি সদর দরজায় হাজির হয় কোন আবেদন নিয়ে তা হলে ওদের বুকটা গর্বে ফুলে ওঠে। ওদের মর‍্যাল বলতে যেমন কিছু নেই, আদর্শও কিছু নেই। ওরা টাকার নেশায় থাকে, যদি ওদের আর্থিক ক্ষতির কোন সম্ভাবনা দেখা না দেয় তা হলে ওরা অতীব বিনয়ী। চাটুকারের মত ব্যবহার পাবেন যদি ওরা বুঝতে পারে আপনি ওদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং প্রভাবসম্পন্ন। এই অঞ্চলের বহু পাপকার্যের নেতা অসীম হালদার কিন্তু কোন সময়ই সম্মুখ সমরে আসেনি। সব সময়ই নেপথ্যে অবস্থান করে পাপকার্যগুলো করেছে। আইনকে রম্ভা প্রদর্শন করার সব পথই ওর জানা আছে। সেজন্য কথাবার্তায় কোন ত্রুটি পাবেন না।

দেখা যাক। আমি ওদের সঙ্গে পরিচিত হতে খুবই আগ্রহী। আমি একাই যাব। আর কেউ সঙ্গে যাবে না। দেখুন, আগামীকাল সকালে দেখা করার কোন সুবিধে করতে পারেন কিনা।

যে কোন সময় দেখা করতে পারেন। এমন কোন অভিজাত নয় যে দরজায় ধর্ণা দিতে হবে। তবুও আগে খবর দিয়ে গেলে অভ্যর্থনা থেকেই বুঝতে পারবেন ওদের আসল চরিত্র কি।

দুই হাত তুলে নমস্কার করে অসীম হালদারের বৈঠকখানায় প্রবেশ করলাম। বাঁশীবাবু দূর থেকে চিনিয়ে দিয়েছিল বলেই চেনার অসুবিধা হয়নি।

মধ্যবয়সী বিশাল বপু, নগ্নদেহ, লোমশ কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিটি আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কিছু বলার আগেই বাঁশীবাবু বলল, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন আমার একজন বন্ধু, কলকাতা থেকে এসেছেন। গ্রামে যখন এসেইছেন তখন গ্রামেব গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করাটা উচিত মনে করে তোমার এখানে নিয়ে এসেছি।

অসীম হালদার আপ্যায়িতভাবে বলল, বেশ করেছ বাঁশীভাই। এই দুর্গম স্থানে আসতে খুবই কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই। এখানে তো দেবারও কিছু নেই, আপ্যায়ন করব তারও উপায় নেই। আমরা গরীবগুবরো লোক, বলতে পারেন হেলে চাষা। গণ্যমান্য কিছু নই।

বললাম, ওটা নিয়ে আমি বিশেষ চিন্তা করিনি হালদারমশায়। বাঁশীবাবুর বাড়ি যাবার সময় দোতালা চকমেলানো বাড়িটা দেখে একবার ইচ্ছে হয়েছিল

এই গৃহের অধিকারীর সঙ্গে আলাপ করব। তাই এলাম। গ্রামে তো অনেক ঝুপড়ি দেখেছি এবার দেখতে এলাম গ্রামের প্রাসাদ।

প্রাসাদ! কি যে বলছেন। এটা কুঁড়ে ঘর বলতে পারেন। আমার কিছুই নয়। বাবামশায় যা কিছু করেছেন। আমি ভোগ করার অধিকারী হয়ে জন্মেছিলাম তাই ভোগ করছি। তাই কি শান্তিতে আছি মশায়। আসল কথাই জানা হয়নি। মহাশয়ের কি করা হয়?

কি করা হয়? কিছুই করি না। কলকাতা শহরে বোজগার করতে জানলে কিছু না কিছু জুটে যায়। সেটাই জুটিয়ে নিয়ে কোন রকমে দিনাতিপাত করি।

অসীম হালদার এরকম উত্তরের প্রত্যাশা করেনি। অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, মহাশয় কোন পার্টির লোক।

আমি কোন পার্টির লোক নই। আমি একাই আমার পার্টি।

অসীম হালদারের ঠোঁটে হাসি দেখা গেল। অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হল। চিৎকার করে ডাকল, ওরে ফটিক, ফটিক।

যাই কর্তা, বলে প্রবেশ করল চোদ্দ পনের বছরের একটা কিশোর।

বাড়ির ভেতর বলে আয় দুটো জলখাবার আর চা পাঠিয়ে দিতে। একটু তাড়াতাড়ি করতে বলিস। কলকাতার লোক, গেঁয়ো নয়। সময় মত সব চাই। বুঝলি।

ফটিক মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তা কি বলছিলাম, ও হ্যাঁ, এই পার্টি মশায় অতিশয় পাজি ব্যাপার। আমার বাবা তো হয়রাণ হয়ে গিয়েছিল। শেষে মনের দুঃখে অকালেই মারা গেছে। আমার ঘাড়েও পার্টির উৎপাত চেপেছে। জীবন যেন যায় যায় মশায়। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। আমিও মশায় পার্টি বুঝি না। চাষার ছেলে চাষ বাস করে খাব। এর বেশি চাই না। আমাদের সরকারও কেমন একটা অদ্ভুত। আরে বাবা বেনামী জমির ধুয়া ধরে আমাদের নাজেহাল করে লাভ কি! আমরা তো বছর বছর হাজার টাকা দিচ্ছি তোমাদের দলকে। আর কত চাই? আমাদের জমি আছে বলেই তো টাকা দিতে পারছি। হাটতলার চা-ওলা কি টাকা দিতে পারবে? যাদের টাকা আছে তারাই দেয় টাকা। টাকাটা আসে জমি থেকে, সেই থেকে যদি আমরা বঞ্চিত হই তা হলে টাকাও আসবে না।

বললাম, আপনার তো টাকার অভাব নেই।

কি বলছেন, টাকার অভাব নেই বললেই হল। ঐ যে খালের ওপারে সাড়ে আঠাশ বিঘা সরেস জমি। আমার সামনে বিক্রি হয়ে গেল। বিজয় কয়াল কিনে নিল। আমার টাকা থাকলে ওটা কি বিজয় কয়াল কিনতে পারত। আমি কিনতাম। টাকার খুবই অভাব আছে মশায়। বাহির থেকে বেশ শাঁসালো মনে হয়। লোকে তাই মনে করে। ভেতর বাড়িটা নতুন করে তৈরি করতে গত বছর তিরিশ হাজার টাকা বের করতে হয়েছে ঘর থেকে। যাই বলুন এমন বাড়ি করেছি দুশো বছরে একটা ফাটল দেখা দেবে না। একেবারে কংক্রীট ঢালাই।

এত সিমেন্ট পেলেন কি করে আর পেলেও তা আনলেন কি করে।

সেকি কম গেরো মশায়। সতের দিন লেগেছে শুধু পারমিট পেতে। এম-এল-এর দরজায় ধর্ণা দিতে হয়েছে, নগদে আর উপঢৌকনে তাকে খুশী করে আলিপুরে আটদিন বসে দরজায় দরজায় প্রণামী দিয়ে মাত্র বাইশ টন মাল পেয়েছিলাম।

বললাম বাইশ টন!

আজ্ঞে মাত্র বাইশ টন মশায়। তাও কি কম হাঙ্গামা। নৌকা করে নদীর ঘাটে এনে তারপর মুটে মজুরের মাথায় চাপিয়ে এক একটা করে ব্যাগ আনতে হয়েছে। কত ব্যয় তা বুঝুন। নদী এখান থেকে দেড় মাইল। ধরুন একটা করে ব্যাগের জন্য মুটেদের পনের পয়সা করে দিতে হয়েছে।

বললাম তাতো বটে। দেড় মাইল পথের জন্য পনের পয়সা। অর্থাৎ মাইলে দশ পয়সা মজুরী।

সেইতো মশায়। আগের দিন থাকলে দেড় মাইলে পাঁচ পয়সা দিলেই চলত। এখন ঐ যে পার্টি। পার্টির ঠেলায় পনের পয়সায় মেটাতে হয়েছে। তাই তো বলছি মশায়, পার্টি আমার কত যে সর্বনাশ করেছে তা বলে শেষ করা যায় না। পার্টির নাম শুনলেই মাথা গরম হয়।

আমি মৃদু হেসে বললাম, তাতো বটেই। স্বার্থে আঘাত যারা করে তাদের ওপর রাগ হয় বই কি।

তা হলে ভাবুন। আমি অন্যায় রাগ কখনও করি না। এই যে ফটিক। বেশ একটু জল খেয়ে নিন। আপনার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পেলাম মশায়। আপনি ঠিক বুঝনদার লোক।

ফটিক কাঁসার থালায় করে মুড়ি, নারকোল, গুড় রাখল সামনের টেবিলে। কাঁচের গ্লাসে জল।

অসীম হালদার খেতে অনুরোধ করে ফটিককে চা আনার আদেশ দিল।

আমরা খেতে শুরু করতেই অসীম বলল, খুব কষ্ট করে তিল কুড়িয়ে তাল করেছিল আমার বাবা। শৈলেন সিং জমিদারের চাপরাশী ছিল আমার বাবা। চাকরি ভরসা। জমি বলতে এক ছটাক ছিল না। তখন তো জমির কোন দাম ছিল না। জমি যে সোনা সে কথা সবাই বুঝে না মশাই। বাবা এক বিঘা দু বিঘা করে জমি কিনে প্রথম বাস্তু পত্তন করেছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তরে দশ বিশ টাকা বিঘে জমি বিক্রি হয়েছে। সেই দাঁও বুঝে কোপ মেরে জমি কিনতে কিনতে এই তল্লাটে প্রায় আটশ' বিঘে জমির মালিক হল আমার বাবা। লোক ঠাট্টা করে মশায়। বলে চাপরাশী জোতদার।

এখনও কি আটশ' বিঘে জমি আছে?

তা নেই। সামান্য কিছু আছে। তা দুশ' বিঘের মত। সবটা আমার নামে নেই। বাবা বেঁচে থাকতেই জমিদারী বিলোপ আইন হল, জমির উর্ধ্বতম সীমা বাঁধা হল। বাবার এক বন্ধু ছিল এম-এল-এ, তার কাছ থেকে অগ্রিম খবর পেয়ে বাবা জমি ভাগ করে নানা জনকে দিয়েছিল। আমার ভাগে পড়েছে সত্তর বিঘে, দিদির নামে আছে সত্তর বিঘে, আমার পিসির নামে আছে চল্লিশ বিঘে। এই হল মোটামুটি জমি। বাকি জমি ভেষ্ট হয়েছে। সে সব জমির হাল আর কি বলব বলুন মশায়। যাদের হাতে জমি সেই শালারা ভাল করে চাষও করে না। আমিই লোকজন দিয়ে চাষ করাই, চাষের পরই শালারা এসে ধান লুট করে নিয়ে যায়।

এবারও আমি হাসলাম।

হাসছেন আপনি। আমার দুঃখের কথা শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। ধান লুঠ বন্ধ করতে পুলিশের কাছে গেলাম। তারা এসে মশায় আমার বাড়িতে ক্যাম্প করল। তাদের তোষণ করতে কত পয়সা যে জল হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। ধান যা পেলাম তা তো মা গঙ্গা জানেন, আমার আড়াই হাজার টাকায় জক্ পড়ল। তবে সেবার পুলিশ এসেছিল বলেই পরের বার কিছু ধান পেয়েছি। এবার আর শালারা আমার জমির ধান লুঠ করতে সাহস পায়নি।

কিন্তু জমিগুলো তো ওদের অর্থাৎ চাষীদের। সরকার-ওদের লাইসেন্স

দিয়েছে জমি চষে পেটের ভাত সংগ্রহ করতে। আপনি কেন চাষ করলেন?

অসীম হালদার একটু অধৈর্যভাবে বলল, তাই বুঝি বলেছে? লাইসেন্স সরকার দিয়েছে ঠিকই কিন্তু যাদের এক বিঘে দিয়েছে তারা দখল নিয়েছে আরও তিন বিঘের। বলুন এ তিন বিঘে তো আমার হকের জমি। আমি কেন ছাড়ব। তার ওপর মশায়, হাইকোর্টে মামলা ঝুলছে। এসব কথা বুঝি শোনেননি। কি করব মশায়, যেমন সরকার তেমনি তার আইন। শালা চাষার যেমন আক্কেল, তেমনি শালা সরকারের।

এ সব নিয়ে তো অনেক হাঙ্গামা হয়।

সে কথা আর বলবেন না। হাঙ্গামা বলে হাঙ্গামা। ওরে ফটিক, এবার চা নিয়ে আয়। আরে বাঁশী, তুমি তো মোটেই খেলে না। আরে খাও খাও।

এই তো বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি।

তা নয়। তোমাদের রাগ যায়নি। পুলিশ তোমাদের ওপর জুলুম করেছে তার জন্য কি আমি দায়ী! তারা যা করেছে তা হল ওপরতলার হুকুম। আমার বাড়ির দুটো ঘরে ওরা থাকত ঠিকই তার জন্য আমার কোন অপরাধ নেই। আমি কখনও কি বলতে পারি তোমাদের ওপর জুলুম করতে। তোমরা আমাকে ভুল বুঝেছ। নাও খেয়ে নাও ভাই। জয়নগর স্কুলে আমরা যখন পড়তাম তখন তো কোন ঝগড়া ছিল না। আমার চেয়ে চার কেলাস নিচে তুমি পড়তে ঠিকই, কিন্তু আমরা দুজন একসঙ্গে বাড়ি আসতাম ছুটিতে। আমার বাড়ি থেকে খাবার পাঠালে আমরা ভাগ করে খেতুম। এসব ভুলে গেছ দেখছি। তবে সংসারে বাস করতে হলে নিজের ন্যায্য পাওনা বুঝে নিতে হয়। তোমার মত বিবাগী তো সবাই হতে পারে না। আমার তো ছেলেপুলে আছে তাদের মুখের দিকে তাকাতে তো হয়।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, আপনার ছেলেমেয়েদের তো দেখছি না।

ওরা এখানে থাকে না মশায়। ওরা সরষে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে থাকে। সেখানে লেখাপড়া শেখে। সে-ও কি কম গেরো। বছর বছর হাজার হাজার টাকা মিশনে দান করি বলেই আমার ছেলেমেয়েদের জায়গা হয়েছে। তা ভালই আছে মশায়। গ্রামের এই স্কুলে কি আর পড়াশুনা হয়। মাস্টাররা তো গাধা। আমরা জয়নগরে পড়তুম তখন মাস্টাররা ছিল এক একজন মহারথী। তেমন মাস্টার আজকাল আর দেখি না।

জয়নগরে না পাঠিয়ে সরষে পাঠানো ঠিক হয়েছে কি?

কেন ঠিক হয়নি।

আমি বলছি না ঠিক হয়নি। তবে ঠিক হবার কতকগুলো সর্ত আছে সেসব পূরণ হবে কি।

বুঝলাম না আপনার কথা।

আপনার ছেলে-মেয়ে যে পরিবেশে বড় হচ্ছে, লেখাপড়া শিখছে সেই পরিবেশ আপনার বাড়িতে নিশ্চয়ই নেই। তারা যখন ফিরে আসবে তখন কি আপনাদের এই পরিবেশ মনের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবে? সেটাই হল জীবনের বড় সর্ত। পিতা-মাতার পরিবেশকে যদি সন্তান ভালবাসতে না পারে তা হলে ভবিষ্যতে সন্তান তার কর্তব্য পালন করতে পারবে এমন ভরসা আমার নেই।

অসীম হালদার কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, সবই ভাগ্য মশায়। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। আমি যখন জয়নগর থাকতুম তখন ওখানে বাবা বাসা ভাড়া করেছিলেন। মা থাকতেন আমার সঙ্গে। আমার ভাগ্নী জামাই ছিলেন আমার প্রাইভেট মাস্টার। অবশ্য তখন তার সঙ্গে ভাগ্নীর বে হয়নি। ভাগ্য দেখুন। কোথায় গেলেন সেই ভাগ্নী জামাই! আজও মাস্টারী করছে, আর কোথায় আমি অসীম হালদার, হাল বেয়ে খাচ্ছি। ভাগ্য মশায়, ভাগ্য।

এবার তা হলে উঠি।

সেকি। এই দুপুরে চলে যাবেন তা হয় না। স্নানাহার করে তবেই যাবেন। সামনেই আমার পুকুর। তিন বছর আগে শান বাঁধিয়েছি। কোন কষ্ট হবে না। স্নানটা করে নিন।

আজ মাপ করতে হবে। সুযোগ পেলে আসব, আপনার আতিথ্য গ্রহণ করব। বাঁশীবাবুর বাড়িতে সব ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে তো বলা হয়নি।

আমি খবর পাঠাচ্ছি। জানেন মশায়, আমার কারবার হল কতকগুলো চাষা ছোটলোক নিয়ে। গাঁয়ের কোন ভদ্রলোক আমার কাছে আসে না। কলকাতার লোক তো দূরের কথা। চাকর-বাকরের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটে। কেমন সময় কাটে তাতো বুঝছেন! আমার বন্ধু বলতে কেউ নেই। আত্মীয়-স্বজন যারা আসে তারাও মনে করে আমি বড়লোক সেজন্য মন খুলে কথা বলে না। আপনি তাওতো আমার কথা বুঝলেন। বসুন।

বললাম, আবার আসব। আজ ছুটি দিন।

উঠে দাঁড়ালাম। বাঁশীবাবুও উঠে দাঁড়াল।

অসীম হালদার আমাদের পেছন পেছন দরজা পর্যন্ত এসে বিদায় দিল।

রাস্তায় এসে বাঁশীবাবু জিজ্ঞেস করল, কেমন মনে হল?

টাইপ।

বাঁশীবাবু কিছু বলতে চেয়ে থেমে গেল। অসীম হালদার সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করল না।

রাতের বেলায় আমার পাশে বসে ভারতী জিজ্ঞাসা করল অসীম হালদারের বিষয়। তাকেও বললাম, টাইপ।

ভারতী বলল, টাইপ বলতে কি বোঝ?

যারা দেশকে ভালবাসে না, মানুষকে ভালবাসে না, পরিবেশকে ভালবাসে না, ভালবাসে শুধু টাকা, আর টাকা সংগ্রহ করার সোর্স জমিকে, সেই টাইপ। অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক, ব্যক্তি সর্বস্ব এমন একটি ব্যক্তি যে ছোটখাট পুঁজিবাদী সেজন্য বেশি ভীতিপ্রদ। এই শ্রেণীর লোকরাই বর্তমান ভারতে সর্বাধিক দুঃখ সৃষ্টি করেছে। অবশ্য রাষ্ট্রীয় সমর্থন না থাকলে এরা শোষণ, লুণ্ঠন, পীড়ন করতে সাহস পেত না। এদের প্রতিনিধিরাই বর্তমান রাষ্ট্রীয় কর্ণধার সেজন্য এদের অবাধ শোষণ, লুণ্ঠন ও পীড়ন আরও কিছুকাল চলবে। তাই বলছিলাম, এই লোকটি একটি টাইপ।

ভারতী বলল, তোমার সঙ্গে কি কথাবার্তা হল তাতো বললে না।

এমন কিছু নয়। তবে অসীম হালদার বক্তা ভাল, কথার বাঁধুনি ভাল। সব কথাতেই তার চরিত্রের বিশেষ একটা দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, সেটা হল অসীম হালদার শুধু নীচাশয় নয়, ঘৃণ্য।

ভারতী আর কোন প্রশ্ন করেনি।

আমার হাত ধরে টানতে টানতে বলল, চল সামনের খালের ধারে বসে গল্প করি।

বললাম, অজানা জায়গায় এভাবে বাইরে থাকা কি ভাল হবে?

তুমি ভয় পাচ্ছ?

না। কোনদিন ভয় পাই নি, এখনও ভয় নেই। তবে বিবেচনার কথা আছে। সাপ দেখে তার মাথায় পা তুলে দেওয়াটা কিন্তু নির্ভীকের লক্ষণ নয়, অবিবেচকের লক্ষণ। সেটা করা কি উচিত হবে। তুমি রাগ করছ? বেশ চল। বিপদ হলে উদ্ধার করবে কিন্তু তুমি।

বেশ, তাই হবে। চল। দেখ, এই খালটার ধারে বিকালবেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। তখনই মনে হয়েছিল এই খালটার যদি বিশেষ কোন সৌন্দর্য থাকে তা দেখার চোখ তোমার আছে। সেই জন্য অপেক্ষা করছিলাম। জানো তো রাতের তাজমহল নাকি সৌন্দর্যের আধার। যারা বলে তারা সুন্দরবনের এই আবাদ অঞ্চলে কখনও আসেনি, তারা বাদার সৌন্দর্য দেখার সুযোগ পেলে আর আগ্রায় ছুটে যেত না।

অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে দুজনে খালের ধারে এলাম।

একটা গরাণ কাঠের গুঁড়ির ওপর গিয়ে বসে তাকিয়ে রইলাম ওপারের খোলা মাঠের দিকে।

ভারতী দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

জিজ্ঞাসা করলাম, ফোঁস-ফোঁসানি কেন?

ভাবছি আরও বিশ বছর আগে যদি এখানে আসতাম তা হলে জীবনে, বলেই থেমে গেল ভারতী। কি যেন কান পেতে শুনল। ফিস্ ফিস্ করে বলল, ঐ ঝোপটার আড়ালে কেউ আছে মনে হচ্ছে।

শেয়াল হতে পারে।

উঁহু। মানুষ। চুপ। আস্তে আস্তে এগিয়ে চল।

ডাকাত হতেও তো পারে।

তা মনে হচ্ছে না। দেখতে পাচ্ছ বিড়ির আগুন, তামাকের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। চল চুপি চুপি। ওরা কারা, কি মতলব জেনে আসি।

দুর্জন হলে বিপদ হতে পারে। আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে আত্মরক্ষা করা কঠিন।

তবুও চল।

আমরা পা টিপে টিপে গাছের আড়াল দিয়ে বসলাম। ঝোপটা তখনও তিনচার হাত দূরে। ঝোপের পেছনে খালে ঢালুতে স্পষ্ট দেখতে পেলাম দু'জনকে। মনে হল একজন নারী অপরজন পুরুষ। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর পুরুষ কণ্ঠে কে যেন বলল, তা হলে তুই যাবি না।

যাব কিন্তু তুই খাওয়াবি কি? তোর তো কিছুই নেই। শেষে আমাকে লাইনে বসাবি নকি?

আবার চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পরে আবার শোনা গেল পুরুষের গলা।

তোর পেটে সন্তান এসেছে তা জানিস? এর একটা বিহিত করতে হবে। এখানেই তুই বিয়ে কর আমাকে।

তা হচ্ছে না। তুই কেরেস্তানদের ঘরের মেয়ে। বাপ-মা রাজি হবে না।

তুই তো রাজি।

রাজি হলে তো পেট চলবে না। তার চেয়ে কটা মাস কোথাও থেকে ছেলের ব্যবস্থা করে যখন ফিরে আসবো কেউ কিছু বলবে না।

এখনও যা, তখনও তা। আমি যাব না।

আকাশের তারাগুলো বোধহয় প্রণয়ী-প্রণয়িনীর নিভৃত আলাপ লক্ষ্য করছিল। আর কোন সাক্ষী ছিল না সেদিন। ভালবাসার পরিণতি যে গুরুতর হতে পারে তা বোঝেনি এই যুবক-যুবতী। ওরা চুপ করে গেল। আমরা ধীরে ধীরে উঠে আবার গিয়ে বসলাম সেই কাঠের গুঁড়িতে।

কি মনে হল তোমার?

ভারতী বলল, আমরা ঐ জীবনে যদি ফিরে যেতে পারতাম, কত সুন্দর হত! এই গোপন অভিসার যে কত মধুর কত মোহময় তা তো বুঝতে পার। যদি তা সমাজে অবৈধ বলে বিবেচিত হয় তা হলে মাধুর্য যেন আরও বেশি সৃষ্টি হয়। মানব-মানবী সৃষ্টির দিন থেকে যে সৃষ্টির নেশা তারই পবিত্র একটি চিত্র আজ দেখছি।

চুপ। ওরা আসছে।

একটি নারী ও একটি পুরুষ অতি সন্তর্পণে সতর্ক পা ফেলতে ফেলতে এগিয়ে আসছিল। গভীর রাতে বাদার এই নদীর কিনারা যে নিরাপদ সে বিষয়ে ওরা ছিল নিশ্চিত। আশা ও আশঙ্কা ছিল না কেউ তাদের এ গভীর রাতে লক্ষ্য করতে পারে।

আমাদের কাছাকাছি আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, কে যায়?

টর্চ জ্বালালাম।

দুজনের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

হঠাৎ বাধা পেয়ে ওরা ঘাবড়ে গিয়েছিল। পালাবার উপক্রম করছিল। বুঝলাম ওদের মনের অবস্থা। বললাম, যাও, কোন ভয় নেই।

তবুও ওরা এগোতে চায় না।

বললাম, দাঁড়িয়ে কেন? যাও। নইলে লোক জানাজানি হবে। সেটাই কি চাও?

দুজনেই থমকে দাঁড়িয়েছিল। আমার কথা শুনে কি যেন ভাবল। তারপরই মেয়েটা এসে আমার দুটো পা চেপে ধরে বলল, কাউকে বলবেন না বাবু।

ছেলেটা পেছনে দাঁড়িয়েছিল অপরাধীর মত। সেও এগিয়ে এল।

আমাদের কথা কাউকে বলবেন না বাবু। তা হলে গাঁ ছাড়া করে ছাড়বে। টেনে নিয়ে যাবে অসীম হালদারের হাতায়। সেখানে পিটিয়ে লাশ করবে।

বললাম, বস তোমরা। ভয় পাচ্ছ কেন? অপরাধ তোমরা কি করেছ জানি না। এত ভয় পাওয়ার নেই, আমরাও ভীতিপ্রদ লোক নই। তোমার নাম কি? দুর্লভ। বেশ নাম তো। আর তোমার বকুল নস্কর। বেশ তো বকুল দুর্লভকে লাভ করেছে, এতে আর দোষের কি? তবে আমি বলছি তোমরা বিয়ে কর। ঘর সংসার কর।

দুর্লভ বলল, আমাদের ইচ্ছাও তাই কিন্তু ও যে কেরেস্তান। বাবা আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবে তখন না খেয়ে মরতে হবে। আমি চাষার ছেলে, অন্য কোন কাজ তো জানি না। তাই ভয় পাচ্ছি।

মোট বইতে তো পারবে।

সে কাজও তো এখানে পাওয়া যায় না।

শহরে যাবে। সেখানে মোট বইবে, রিক্সা চালাবে। বকুলও কাজ করবে কোন বাড়িতে। দিন তোমাদের চলে যাবে। তা বলে বকুলকে জলে ভাসিয়ে দিতে তো পার না। তার পেটে সন্তান রয়েছে।

দুর্লভ বলল, আপনি জানলেন কি করে?

তোমরা বলাবলি করছিলে।

ওরা গম্ভীর হয়ে বসে রইল।

আমরাও আর বলতে পারিনি! একদল রাত্রিচরা পাখি মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। দূর থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে আসছিল। কোন গেরস্থ বাড়ির কুকুর ডেকে উঠল শেয়ালের গলার শব্দ পেয়ে।

আচ্ছা তোমরা যাও। আমরা বিদেশী লোক। আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করব না। তবে তোমরা যদি বিয়ে করে ঘর সংসার করতে পার তাতে সুখী হব।

দুর্লভ আর বকুল হেঁট মাথায় উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল খালের কিনারা বরাবর। তাদের জিজ্ঞেসও করিনি কোথায় তাদের বাড়ি, কি

তাদের পরিচয়। প্রয়োজন মনে করিনি। ভারতীও কোন কথা জিজ্ঞাসা করেনি।

ওরা চলে যাবার পর ভারতী বলল, এবার ফিরে চল।

যাচ্ছি, বলেও বসে রইলাম।

কি ভাবছ?

ভাবছি মানুষের আদিম বৃত্তির কথা। মানুষ কেন, জীব মাত্রেই তো সৃষ্টির নেশায় পাগল। অথচ মনুষ্য সমাজে এর জন্য কত বিঘ্ন। দুর্লভ ও বকুল দুজনকে ভালবাসে কিন্তু তারা ঘর বাঁধতে পারছে না, অথচ আদিম রিপুকে সংযত করার মত তাদের শিক্ষা অথবা ক্ষমতাও নেই। হয়ত এরা বিয়ে করবে না, হয়ত বা বিয়ে করবে। তারপর একদিন আহারের অভাবে ছটফট করতে করতে দুজন দুই পথে ছুটে যাবে। তাদের প্রেম-ভালবাসা ঘর বাঁধার আশা-আকাঙ্খা চিরতরে লুপ্ত হবে। ওরা তখন হবে রুটির কাঙ্গাল, পথে পথে ঘুরবে, ভিক্ষা চাইবে, ফুটপাতে আশ্রয় নেবে। এইভাবেই এদের সমাপ্তি নেমে আসবে। এদের বিষয়ে কোন ইতিহাসে লেখা হবে না। এদের জন্য কোন শোকসভা হবে না, অবহেলিত অনাদৃত মানুষ সমাজের কক্ষপথ থেকে স্থানচ্যুত হবে, কারও মনে কোন রেখাপাত করবে না।

এদের বাঁচাতেই তো এত আন্দোলন।

কিন্তু আমাদের সামনে কোন ফল এখনও দেখা দেয় নি। ভবিষ্যতে হয়ত গড়ে উঠবে প্রচন্ড বিক্ষোভ, মানুষ ছুটবে প্রাণ দিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে কিন্তু সে দিন খুব নিকটবর্তী মনে হচ্ছে না।

সেদিন খুব দূরেও নেই। আমরা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এদের সর্বনাশ ডেকে আনছে, সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সর্বনাশ উপস্থিত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে বিশ্বের সর্বত্র, ভারতেও ভেঙ্গে পড়বে। তবে যারা সমাজতন্ত্রের আর গণতন্ত্রের ভেক্ নিয়ে রাষ্ট্রের কর্ণ ধারণ করে আছে, তারা অতিশয় চতুর এবং চাতুর্য বলে আরও কিছুকাল টিকে থাকতে চায়। এদের চাতুর্যের মুখোসও খুলে পড়েছে। সে জন্য আমি খুবই আনন্দিত।

আমি আর কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়িয়ে ভারতীর হাত ধরলাম। এগিয়ে চললাম বাঁশীবাবুর বাড়ির দিকে। আগামী কাল সকালে আবার এগিয়ে যাব ছোট্ট নদী পেরিয়ে বড় নদীর সন্ধানে।

আবার সকাল হল। আবার ব্যস্ততা দেখা দিল। আমরা প্রস্তুত হলাম নদীর ওপারে যেতে। সেখানে বিশেষ উদ্বেগ বোধ করিনি। ইসুফ পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে প্রস্তুত। আমরা অপেক্ষা করছি গরম চায়ের। চা পান করেই রওনা হব। বাঁশীবাবু যেতে পারবেন না। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে জয়াবতী।

সকালের রোদে হেঁটে চলতে ভালই লাগছিল। ভারতীকে কেমন ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। বার বার তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম মুখ ফিরিয়ে।

ভারতী জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছ?

তোমাকে দেখছি। ভাবছি তুমি কি যেতে পারবে?

পারব গো পারব। পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেলেও আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।

যদি অসুস্থ হয়ে পড়, তখন অসুবিধা হবে সবাইয়ের।

তোমাকে ভাবতে হবে না। চল তো।

বাঁশীবাবু নদীর ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন মনে করে আমাদের সঙ্গে আসছিল। পেছন থেকে বলল, দিদির যদি কষ্ট হয় দুটো দিন গরীবের ঘরে আতিথ্য নিন। দাদারা ফিরতি পথে আপনাকে সঙ্গে করে নেবেন।

ভারতী হেসে বলল, বাঁশীবাবু আপনি তো শুনেছেন হিন্দুঘরের মেয়েদের কৃচ্ছ্রতার কথা, হয়ত দেখেওছেন। হিন্দু মেয়েরা স্বামী যা পছন্দ করে না তা করেন না, স্বামী যা খেতে ভালবাসে তাই রেঁধে খাওয়ান, স্বামীর পোষ্যদের নিজের পোষ্য মনে করে যত্ন করেন।

বাঁশীবাবু বাধা দিয়ে বলল হয়েছে, আর বলতে হবে না। আমি কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। আপনাদের চলার পথ নির্বিঘ্ন হোক।

বাঁশীবাবুর বলার ভঙ্গীতে আমরা হেসে উঠলাম।

নদীর ঘাটে এসে বিলম্ব করতে হয়নি। জোয়ারের টানে নদী ভর্তি। পারাপারের নৌকাও প্রস্তুত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওপারে পা দিলাম। ওপার থেকে হাত তুলে বাঁশীবাবুকে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। নৌকায় উঠবার সময় বলেছিলাম, বিকল্প কোন ফেরার পথ থাকলে সেই পথেই আমরা ফিরব। বাঁশীবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করার ইচ্ছা থাকলেও তা সম্ভব নাও হতে পারে।

বিকল্প পথ আছে সেটা বাঁশীবাবুর অজানা নয়, জয়াবতীও জানে সেজন্য

পীড়াপীড়ি না করে বাঁশীবাবু উদাসভাবে বলেছিল, আপনার ইচ্ছা।

ওপারে এসে জয়াবতী মুখ খুলল। তার কাছে উদ্ভট কাহিনী শোনা যায়। এমন তার বাক্‌নৈপুণ্য যে সে মোহময় করে তোলে তার কাহিনী দিয়ে।

জয়াবতী বলল, মোটামুটি দেখলেন তো বাদার চাষী, ভাগচাষী, জোতদার আর মহাজনদের অবস্থা।

বললাম, হুঁ।

এবার আমরা আশ্রয় নেব বাদামতলীতে। বাদামতলী থেকে খাস সুন্দরবন হল মাইল দেড়েক দূরে। এপার, ওটা ওপার।

ইসুফ বলল, বাঘের ভয় নেই তো?

জানি না। হয়ত আছে। তবে বাঘের চেয়ে সাংঘাতিক আর কুমীরের চেয়ে ভয়ঙ্কর একটা গৃহপালিত জীবের সঙ্গে পরিচয় হবে।

ভারতী বলল, সেটা আবার কোন্ বিখ্যাত জীব?

বলব। পরে বলব। আগে বাদামতলী ছিল মাখনের আড়ত। এখান থেকে মোষের দুধের মাখন চালান যেত কলকাতায়। এখন আর তেমন মোষ পোষার লোক নেই। যাদের আছে তারাও খেতে দিতে পারে না। গোচারণের মাঠের বড়ই অভাব। গরুর নাম গন্ধ নেই, যা আছে মোষ। তাদের খাবার সংগ্রহ করতে হয় সুন্দরবন থেকে। পশু খাদ্যের খুবই অভাব।

সুন্দরবন থেকে ঘাস কেটে আনতে হয় বুঝি। নদী পেরিয়ে ওপারে গেলে প্রাণ নিয়ে ফেরা কঠিন ব্যাপার নয় কি!

নিশ্চয়ই কঠিন ব্যাপার কিন্তু যাদের খাদ্য তারাই তা সংগ্রহ করে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ সকালবেলায় মোষগুলো নদী সাঁতরে ওপারে গিয়ে ঘাস খায় আবার বিকেলবেলায় ফিরে আসে।

নদীতে কুমীর রয়েছে, বনে বাঘ রয়েছে, মোষ নদী সাঁতরে গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারে কি কখনও?

সেটাই তো আশ্চর্য ঘটনা। গরু পারে না কিন্তু দলবদ্ধ মোষ পারে। আজ পর্যন্ত একটা মোষও খোয়া যায় নি। কাল সকালবেলায় বাদামতলীর ঘাটে গেলে দেখতে পাবেন নদীর জলে কালো কালো মাথা ভাসছে। মোষগুলো নদী পার হচ্ছে সাঁতরে। দলবদ্ধ মোষের পা কামড়ে ধরার সাহস পর্যন্ত নেই

কুমীরের। গ্রামের লোকের কাছেই শুনতে পাবেন, কোন সময় কুমীর যদি মোষের পায়ে কামড় দেয় সেই কুমীর আর জীবন্ত ফেরে না। আক্রান্ত মোষের সঙ্গীরা ধারালো শিং দিয়ে কুমীরকে এফোঁড়-ওফোঁড় না করা পর্যন্ত থামে না। নদীর জলে তখন যুদ্ধ চলে। তোলপাড় হয় নদীর জল। কুমীর খুব বোকা জানোয়ার নয়। মোষের ঘ্রাণ পেলেই পথ ছেড়ে দেয়। তাই তো বলছিলাম, কুমীরের চেয়ে ভয়ঙ্কর গৃহপালিত প্রাণী দেখবেন বাদামতলীতে।

ইসুফ বলল ব্যাঘ্রমহাশয়রা তো মহিষাসুর বধ করতে কৃতী।

কথাটা বেঠিক নয়। একাকী সঙ্গী ছাড়া মোষ ব্যাঘ্রমহাশয়রা নিশ্চয় ফলারে মেতে উঠতে পারে কিন্তু দলবদ্ধ মোষের ত্রিসীমানায় দি গ্রেট রয়েল বেঙ্গল টাইগারও পদক্ষেপ করে না। তা যদি হত তা হলে মোষগুলো নিরাপদে নদী পারাপার করত না। ইচ্ছে করলে মোষের পিঠে চেপে আপনিও নিরাপদে ওপারে যেতে পারেন, ফিরেও আসতে পারেন। বাঘের চেয়েও ওরা সাংঘাতিক। নদীর কিনারায় যে সব গ্রাম সে সব গ্রামে গরুর সংখ্যা খুব কম। অনেক সময় বাঘও নদী পেরিয়ে আসে, গরু-মানুষ যা সামনে পায় তা ধরে নিয়ে যায়। মোষের খাটালে ভুলেও অগ্রসর হয় না। সেজন্য নদীর কিনারায় চাষবাসের জন্য মোষের প্রয়োজন হয়। চাষীরা মোষগুলোকে যত্নও করে। তবে আগে যত মোষ ছিল তার শতকরা পাঁচভাগও আছে কিনা সন্দেহ। সামনেই বাদামতলী। এই গ্রামটা পেরিয়ে সামনে ঐ যে গ্রামটা দেখছেন ওটাই বাদামতলী।

জয়াবতী মিথ্যা বলেনি।

আমরা আড্ডা নিলাম হাকিম আলির বাড়িতে। হাকিম আলি সামান্য কয়েক বিঘা জমির মালিক। ভাগেও চাষ করে। জোতদার মহাজনের পাওনা মিটিয়ে কোন রকমে দিন কাটায়। তার উপরি আয় হল মৌলাদের খাবার যোগাড় করে দেওয়া। হাকিম আলির বাড়ি গ্রামের শেষ প্রান্তে। বাড়ি বলতে একখানা ঘর। খড়ে ছাওয়া ঘরের চারিদিকে বারান্দা। বারান্দা হোগলার ঝাঁপ দিয়ে ঢাকা। দরকার মত তুলে দেওয়া যায়। দরকার হলেই ঝাঁপ বন্ধ করা যায়। হাকিম আলির বয়স পঁয়ত্রিশের মধ্যে। সবল দেহী, চোখে মুখে বেশ একটা আত্মবিশ্বাসের ছাপ।

আমরা আশ্রয় পেলাম হোগলা ঘেরা বারান্দায়।

সকালবেলায় মুড়ি গুড় খেয়ে বের হলাম গ্রাম দেখতে। হাকিম আলির উঠোনে একগাদা ধান। তখনও ঝাড়া হয়নি।

কেন ঝাড়া হয়নি জিজ্ঞেস করতেই হাকিম আলি বলল, ঝেড়ে মরাই বাঁধতে হবে। এখন সময় পাচ্ছি না। এই সপ্তাহেই ধান ঝাড়া শেষ করব মনে করছি।

এবার কত ধান পাবে তুমি?

দিয়ে থুয়ে বিশ মণ ধান পাব আশা করছি।

তাতে সংসার চলে?

চলে না, তবে চালাতে হয়। মাসে দেড় মণ চাল দরকার হয়। বিশ মণ ধানে খুব বেশি হলে ষোল মণ চাল পাব তাতে ঘাটতি থাকবেই দাদা। এই ঘাটতিটা মেহনত করে পূরণ করতে হয়।

গ্রাম ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে হাকিম আলি দাঁড়িয়ে গেল। ঐ যে দোতলা বাড়ি দেখছেন ওটা হল বিজয় কয়ালের বাড়ি। ধানের গাদা গুনে দেখুন।

গুনে গুনে মাথা খারাপ হবার উপক্রম। একবার গুনলাম একাশি একবার গুনলাম আটাত্তর। অথচ কোনটাই ঠিক নয়। হাকিম আলি বলল, আমার গোনা আছে। তিরাশিটা গাদা আছে. গাদাগুলো কত উঁচু দেখতে পাচ্ছেন। কম করেও তিন হাজার মণ ধান পাবে অথবা পেয়েছে বিজয় কয়াল। অথচ লেভির নোটিশ এসেছে আশি কুইন্টাল ধান দেবার। সরকারী কর্মচারীরা কি দেখছে না, যে দেশের আইনে পঁচাত্তর বিঘার বেশি জমি থাকা বে-আইনী, সে দেশে কারও ঘরে তিরাশিটা ধানের গাদা কোথা থেকে আসে! এটা সরকার জানতে চায় না কেন? আর যে লোকের ঘরে বছরে তিন হাজার মণ ধান ওঠে, সে-লোককে এত কম লেভির ধান দিতে হবে কেন, এটাও কেউ প্রশ্ন করে না। আমরা একথা বলতে গেলেই আমাদের গলাকাটা যাবে। বামপন্থীদের ওপর হামেশাই তো অত্যাচার চলছে। এরপর কিছু বলার অর্থ হল আরও অত্যাচার সহ্য করা।

জয়াবতী হাকিম আলিকে বাধা দিয়ে বলল, হাঁ. হাঁ মনে পড়েছে। এই বিজয় কয়ালের বাড়িতে একবার ডাকাতি হয়েছিল না?

হয়েছিল। ঠিক সন্ধ্যাবেলায়। অথচ বিজয় কয়ালের ঘরে দুটো বন্দুক।

ডাকাতের চালাকিতে টাকা-পয়সা গয়না তৈজস ও বন্দুক সব হারিয়ে ছিল বিজয় কয়াল।

ঠিক সন্ধ্যাবেলায় পুলিশের পোশাক পরে ছয়জন লোক এসে বিজয় কয়ালকে বলল, তোমার লাইসেন্স দেখাও। বন্দুক নিয়ে এস। বেচারা বিজয় কয়াল পুলিশ মনে করে বন্দুক দুটো এনে দিতেই ডাকাতরা বন্দুক দুটো হাতিয়ে নিয়ে বাড়ি লুট করতে লাগল। লুটের ধন বেশি ছিল না। বিজয় কয়াল টাকা রাখে ব্যাঙ্কে, গয়নাপত্র থাকে সেফ্ ভল্টে। তবুও নগদ হাজার দুয়েক টাকা। পাঁচ ছয় হাজার টাকার গয়না ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছিল ডাকাতরা। পাপের পয়সার কিছুটা সদ্ব্যবহার হয়েছিল। তবে পাপ নির্মূল করতে পারে নি। আগেও যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। বরং আজকাল যেন বিশেষ উগ্রধরনের লোকে পরিণত হয়েছে। বিজয় কয়ালের পূর্বপুরুষরা এসেছিল মেদিনীপুর থেকে। লোক প্রবাদ, বিজয়ের বাবার ঠাকুরদা পোর্ট ক্যানিং রেলপথ বসানোর সময় মাটি কেটে ঝোড়া বোঝাই দিয়ে মাথায় করে মাটি ফেলত। রেল লাইনের কাজ শেষ হলে সেই ভাগ্যান্বেষী জওয়ান লোকটা বাদার গভীর জঙ্গলে এসে কয়েকজন আদিবাসী আর তিওরদের নিয়ে ডাকাতের দল গড়েছিল। নৌকা লুট করা ছিল সে সময়ের বড় কাজ। বরিশাল থেকে পাইকার মহাজনরা বড় বড় নৌকা করে বালাম চাল আর নারকোল নিয়ে যেত কলকাতার বাজারে। সমুদ্রের খাড়ি পথে চলতে হলে মিষ্টিজল দরকার হয় রান্না খাওয়া করতে। বাদামতলীর ঘাটে অনেকে নৌকা বাঁধত মিষ্টি জলের আশায়। রাতের বেলায় সেই সব নৌকায় ডাকাতি করত বিজয়ের বাবার ঠাকুরদার দল।

ভারতী জিজ্ঞেস করল, এ সব ঘটনা কার কাছে শুনেছ হাকিম ভাই?

শুনেছি আমার ঠাকুরদার কাছে। ঠাকুরদার বয়েসী অনেকের কাছে। বিজয় কয়ালের পূর্বপুরুষ যে ডাকাতি করত তার আরও প্রমাণ আছে। সরকারী খাতায় এখনও ভুলু কয়ালের নাম নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। এই ডাকাত দল লুটপাট করত, নৌকায় আরোহীদের খুন করে জলে ভাসিয়ে দিত। নৌকা নিয়ে যেত মাঝ নদীতে, সেখানে নৌকাও ডুবিয়ে দিত। এইভাবে অর্থ উপার্জন করে ভুলু কয়াল জমি কিনত, জমিদারদের কাছ থেকে পত্তন নিত। সব সম্পত্তিই করেছিল তার ছেলে অনাদির নামে। অনাদি কয়াল আমার ঠাকুরদার বয়সী। ছেলেবেলায় দুজনে মাঠে গরু চড়াত, মোষের পিঠে চড়ে বেড়াত।

ভুল কয়াল অনেক কাল পুলিশকে ফাঁকি দিয়েছিল। গোসাবার সাহেব জমিদারদের এলাকায় ডাকাতি করতে গিয়ে ফেঁসে গেল। সাহেবের গুলিতে জখম হল ভুলু কয়াল, ধরাও পড়ল। বিচারে দশ বছরের জেল হল তার। দশ বছর পর ভুলু কয়াল যখন ফিরে এল তখন আমার ঠাকুরদা জওয়ান মরদ। আমার বাবার জন্ম হয়েছে। সেজন্য সবটা লোক প্রবাদ নয়, গুজব নয় দিদি। সত্য ঘটনা। ডাকাতি করেই ওরা সম্পত্তি করেছে এটা সবাই জানে। আগে এসব ঘটনা মুখে মুখে চলত। আজকাল কেউ আর বলতে সাহস পায় না। এখন বিজা হল মণ্ডলের অধিপতি। তার বিষ নজরে পড়লে ধনে প্রাণে মারা যাবে বিরুদ্ধ দল। জানেন তো, মনের ব্যথার ছাপ মুখে ফুট উঠলেই জীবনহানি ঘটে এই বাদা অঞ্চলে। এইসব জোতদারদের মাইনে করা গুণ্ডারা না পারে হেন কাজ নেই।

ইসুফ বলল, ভাড়া করা গুণ্ডা থাকতেও ডাকাতি হল কি করে?

কেউ ভাবতেও পারেনি সন্ধ্যাবেলায় ডাকাতি হবে বিজয়ের বাড়িতে। প্রস্তুত ছিল না কেউ। তার ওপর সে সময় তাড়ি খাবার মরশুম, ওরা তখন তাড়ির নেশায় মশগুল ছিল। ওরা সবাই তো পাপী লোক। পুলিশের খাতায় ওদের নাম আছে। পুলিশ দেখেই গা ঢাকা দিয়েছিল। ডাকাতি করার পথটা সহজ হয়েছিল এই ভাবেই। তবে এতে বিজয় কয়ালের মূলধনে হাত পড়েনি। বিজয় কয়াল অবস্থা সামলাতে একদিনও দেরি করেনি। তবে বন্দুক দুটো হাত ছাড়া হওয়াতে নতুন বন্দুক পেতে এক বছর যা দেরী হয়ে গেছে। ভুলু কয়ালের ডাকাতির সম্পত্তি, সেই সম্পত্তি কেড়ে নিতে কি কোন ডাকাত পারে। এখানকার বেশির ভাগ জোতদারের ইতিহাস হল ডাকাতির ইতিহাস। যারা ডাকাতি করে সম্পত্তি করেনি তাদের অনেকেই ডাকাতের থানিদার। ডাকাতির মাল কেনাবেচা করে সম্পত্তি করেছে। সৎভাবে সম্পত্তি করা লোক বিরল বলতে পারেন দাদা। এখানে শুনতে পাবেন জোতদারদের নানা বিশেষণ। ওপারে তো শুনে এসেছেন চাপরাশী জোতদার, এপারে ডাকাত জোতদার। আরও ভাটিতে গেলে বউচোর জোতদারও পাবেন। সুন্দরবনের সম্পত্তি লাভের ইতিহাসেব সঙ্গে নোংরামি, রক্তপাত, অত্যাচার আর শোষণ যেন গায়ে গা দিয়ে আছে।

হাকিম আলি থামতেই বললাম, চাষীরাও তো জোতদারদের ওপর অত্যাচার করেছে।

কে এইসব আজগুবী কথা আপনাদের বলেছে? এসব মিথ্যা কথা। নিজের চোখে দেখে যান দু একজনের ঘরে হাজার হাজার মণ ধান, আর হাজার হাজার মানুষ ধানের ক্ষুধায় অস্থির। এই হল এখানকার অবস্থা। নীল চাষের ইতিহাস তো পড়েছেন, যখন জমিদার লাটদার ছিল তখন এদের অবস্থা নীল চাষীদের চেয়ে খুব ভাল ছিল না। জোতদাররা আরও জঘন্য চরিত্রের। জমিদারদের কিছু দয়ামায়া ছিল, জোতদারদের তাও নেই। আমার বাবা এবং মুরুব্বিদের কাছে শুনেছি, মাটির ক্ষুধাটা প্রবল হয়েছিল পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর। আগে লোকে জমির এত মূল্য তা বুঝত না। খাবারের অভাব হতেই জমির মূল্য বুঝেছে। যাদের অর্থ ও লোকবল ছিল বা আছে তারা ছলে বলে কৌশলে জমি দখল করে মাটির ক্ষুধা মেটাচ্ছে। আজ আপনাকে নিয়ে যাব কয়েকটি বস্তিতে। তাদের মুখেই শুনবেন কি অত্যাচার তারা সহ্য করছে। অথচ আমরা স্বাধীন দেশের লোক, আমাদের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে সরকার আইন করেছে। আইন করলেই লোকের দুঃখ কমে না, আইন যাতে নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ হয় সেদিকে সরকার কখনও নজর দেয় না। যারা অত্যাচার করে তারাই ভোট সংগ্রহ করে দেয়, তাদের ভাড়াটে গুণ্ডারা কারচুপিতে সাহায্য করে, এরপর সরকার কি এইসব ধনাঢ্য জোতদারদের অসন্তুষ্ট করতে পারে, তাই আইন কাগজেই থাকে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ আজও হয়নি।

আমরা ফিরে এলাম হাকিম আলির বাড়িতে। হাকিম আলির স্ত্রী পরিপাটি করে মাংস ভাত খাইয়ে বার বার তার অক্ষমতার জন্য মাপ চাইল। আমরা যতই বলছি, তোমার কোন ত্রুটি হয়নি ততই সে মনগড়া ত্রুটির ফিরিস্তি দিয়ে মাপ চাইতে থাকে।

আজ অনেক দিন পরে ভারতীকে যেন নতুন করে পেলাম। হাকিম আলির স্ত্রী যতই ত্রুটির কথা বলছিল ততই মৃদু মৃদু হাসছিল ভারতী। অবশেষে সে বলল, রাতের রান্না আমি করব। ত্রুটি বিচ্যুতি যদি ঘটে তার দায়িত্ব আমার, তোমার নয়। শহরের মানুষ কি খায় তা তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

ভারতীর প্রস্তাব হাকিম আলির স্ত্রীর মনঃপুত হয়েছিল। সে আর কোন কথা না বলে পরিবেশনে মনোযোগ দিল।

আজ ভারতীর নতুন চেহারা দেখলাম।

বিকেলবেলায় পাশের পুকুরে ময়লা কাপড় জামার গাদা আর সাবান নিয়ে

বসল। সন্ধ্যার আগেই কাপড় কাচা শেষ করে কোমরে কাপড় জড়িয়ে হাকিম আলির রান্নাঘরে প্রবেশ করে তার স্ত্রীকে স্থানচ্যুত করে রান্নার কাজে হাত দিল।

আমি দূর থেকে দেখছি আর ভাবছি, এটাই বোধহয় ভারতীর আসল চেহারা। এই চেহারাটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল সংসারকে সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত করতে না পেরে।

রাতের বেলায় খেতে বসে দেখলাম ভারতী তার আসন করে নেয় নি। রান্না ও পরিবেশন সব কিছু নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। ভাত, ডাল আর আলু সেদ্ধ বিনা অন্য কিছুই রান্না করেনি। গরম গরম ভাত-ডাল অমৃত সমান মনে হচ্ছিল। আমাদের খাওয়া শেষ হতেই ভারতী হাকিম আলির স্ত্রীর হাত ধরে নিয়ে গেল। তারা দুজনে খেতে বসেছিল কিন্তু খাবার চেয়ে গল্পের আসর যেন বেশি। ঘণ্টা দেড়েক পর তারা বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে।

রাতের বেলায় নিরিবিলি পেয়ে ভারতীকে জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ তুমি সংসার সাজাতে নেমে পড়লে কেন?

ভারতী হেসে বলল, হঠাৎ কেনবা মনে হল সংসারের অনেক কাজেই আমি ফাঁকি দিয়েছি, অবহেলা করেছি। এর জন্যই বোধহয় তোমাকে কাছে পেয়ে মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলি। মনে হল, এই জীবনের চেয়েও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন আর কিছু নেই।

বললাম, বুঝলাম। হাকিম আলির স্ত্রীর সঙ্গে এতক্ষণ কি আলোচনা করলে বলত?

মেয়েদের কথা শোনার এত আগ্রহ কেন বলতে পার?

হেসে বললাম, পুরুষরা চিরকাল মেয়েদের কথা শোনে। আর পুরুষদেব মনের কথা না বললে মেয়েদের মনে শান্তি আসে না। পুরুষরা পাশে থাকে বলেই তো তোমাদের এত গরিমা।

মোটেই নয়। মেয়েরা পাশে এসে দাঁড়ায় বলেই পুরুষরা পৌরুষ জানাবার সুযোগ পায়। তোমাদের পৌরুষ তো মেয়েদের কাছে। শোননি বুঝি। দাদা মরদ বৌদির কাছে, পাড়ায় দাদা গোবর গণেশ। তবে মেয়েদের তোমরা মোটেই যে মর্যাদা দিতে চাও না এটা সর্বকালের সত্য।

অর্থাৎ পুরুষ তার গার্জেন সাজার অধিকার ত্যাগ করতে চায় না। তাই

কি কেউ চায়? তুমিই তো বললে, দাদা মরদ বৌদির কাছে। দাদা যদি কোথাও তার গার্জেনী ফলাতে না পারে তা হলে দাদা তো দিদি হয়ে যাবে। মাসীর গোঁফ গজালে মামা হয় তা বুঝি শোন নি।

বাজে কথা ছাড়। এবার ঘুমোও।

কোথাও যাবে নাকি?

না। ও পাশে বিছানা করেছি। ঘুরতে ঘুরতে বেশ ক্লান্ত হয়েছি। এবার একটু গড়িয়ে নেব। তুমি ঘুমোও।

ভারতী উঠে যাবার চেষ্টা করতেই করুণ একটা ক্রন্দনের শব্দ নিকটবর্তী কোন স্থান থেকে ভেসে এল। মহিলার কণ্ঠস্বর। দুজনেই থমকে গেলাম।

কে কাঁদে এত রাতে!

দু'জনের মনে একই প্রশ্ন।

ভারতী বলল, চল দেখে আসি।

রাজা বিক্রমাদিত্যের গল্পের মত হবে না কি?

তা হোক। রাজার ক্ষমতা ছিল চোখের জল মোছাবার। আমাদের সে ক্ষমতা নেই। কিন্তু ঘটনাটা জানার ক্ষমতা আছে। কেউ মারা গেছে। কোন মহিলার স্বামী অথবা পুত্র মারা গেছে। চল না, দেখে আসি।

অগত্যা বিছানা ছেড়ে উঠতে হল।

টর্চ হাতে করে কয়েক ধাপ এগিয়েই দেখলাম অন্ধকারে কে যেন বসে আছে।

কে রে, কে ওখানে?

আমি হাকিম আলি। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছ না হাকিম ভাই?

হাঁ। রোজ রাতে কান্নার শব্দ শুনতে পাই। বনের গাছপালার পাতায় পাতায় এই কান্নার শব্দ ধাক্কা খায়। ধাক্কা দেয় আমাদের মত অভাজনদের কিন্তু যারা কান্নার পথ খুলে দিয়েছিল তাদের মনে সামান্যতম রেখাপাতও করে না। বসুন। বলছি ওর কথা।

গত বছর খুব খরা হয়েছিল। গ্রামের মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় পাগল হয়ে উঠেছিল। কেউ খেতে দেবার নেই। সরকার খয়রাতের ব্যবস্থা করল। প্রথম নম্বরে টি-আর, অর্থাৎ টেস্ট রিলিফ। মাটি কাটার বিনিময়ে মাথা পিছু ভুট্টা, বাজরা জাতীয় খাদ্য। দ্বিতীয় নম্বরে জি-আর, গ্র্যাটুইটাস্ রিলিফ, যাকে বলে

ভিক্ষা দেবার ব্যবস্থা। অঞ্চল পঞ্চায়েত থেকে লিস্ট দেওয়া হত। সেই লিস্টের লোকদের সপ্তাহে ভুট্টা বাজরা কিছু কিছু দেওয়া হত। যে মহিলাটি কাঁদছে সে এখানকার কৃশ্চান বস্তীর বৃদ্ধা।

এই বৃদ্ধা কেঁদে কঁকিয়ে পঞ্চায়েতের হাত-পা ধরে লিস্টে নাম তুলেছিল। প্রতি সপ্তাহে দু-কেজি মোটা দানার খাদ্য-শস্য পাওয়া উচিত। বৃদ্ধা নিজে যেতে পারত না। তার নাতি পাদরী যেত খয়রাতি-শস্য আনতে। প্রতিবারই যা প্রাপ্য তার অর্ধেক তো দিতই, সঙ্গে সঙ্গে দশটা করে নগদ পয়সা আদায় করত। যারা নগদ দিতে পারত না তাদের প্রাপ্য শস্য কেটে রাখত। রিলিফের খাদ্য-শস্য এই ভাবে চুরি করে ওরা ব্যবসা করত। দু-এক সপ্তাহ এই ভাবেই কেটে গেল। পাদরী প্রতিবাদ জানাল তৃতীয় সপ্তাহে। কথা কাটাকাটি হল পঞ্চায়েতের সঙ্গে। পরের সপ্তাহে পাদরী যেতেই তাকে বলা হল, তার ঠাকুমার জি-আর বন্ধ। কেন? 'কেন' শব্দের উত্তর ওরা দেয় না। পাদরী বুঝেছিল। বলল, তোমরা চুরি করে করে রিলিফের মাল বিক্রি করবে। আমরা বললেই অপরাধ। তারপর যা হয় অর্থাৎ ঝগড়া-ঝাটি। পরিণামে পাদরীর চুলের মুঠি ধরে মাটিতে শুইয়ে থান ইঁট দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে বহু লোকের সামনে তাকে পিটিয়ে হাত পা ভেঙ্গে দিল।

খবর পেয়ে এ গাঁয়ের লোক গিয়ে পাদরীকে অর্ধমৃত অবস্থায় ধরে নিয়ে এল। কয়েকদিন পরে পাদরী মারা গেল বিনা চিকিৎসায় এবং অনাহারে। সেই শোক তার বৃদ্ধা ঠাকুরমা আজও ভুলতে পারে নি। মাঝরাতে একা সামনের বাঁধে বসে আছাড়ি-পিছাড়ি করে প্রেমের ঠাকুর যীশুখ্রীষ্টের দরবারে অভিযোগ ও আবেদন পেশ করে। সেই কান্নার শব্দ শুনেছেন। কাল কৃশ্চান পাড়ায় নিয়ে যাব সেখানে গেলে দেখতে পাবেন বৃদ্ধাকে। কাঁদতে কাঁদতে প্রায় অন্ধ হবার উপক্রম। উপরন্তু খাদ্যেব অভাব আব বেশি দিন হয়ত বাঁচবেও না।

রাস্তার কুকুরকে যেমন ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে নির্দয়ভাবে মারা হয় তেমনি ভাবে পাদরীকে হত্যা করেছিল পাশের গ্রামের রিলিফের কর্তারা। অথচ এর প্রতিবিধান হল না। না এল পুলিশ, না এল সমাজের মাথারা। কেউ এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি, ওর ঠাকুরমা একাই কাঁদছে। কিন্তু এদেরই পূর্বপুরুষরা এসেছিল এখানে আবাদ কায়েম করতে। ইংরেজ ধর্মযাজকরা দিয়েছিল মোক্ষলাভের প্রলোভন, ইংরেজ সরকার দিয়েছিল মাটির ক্ষুধা

মেটাবার প্রলোভন। তিন পুরুষ না পেরোতেই এরা ভিক্ষা-পাত্র হাতে নিয়ে পথে পথে ঘুরছে। না পারছে প্রেমের দেবতা এদের মোক্ষপথে নিয়ে যেতে, না পারছে সরকার এঁদের পেট পুরে দু'মুঠো ভাত দিতে।

এই কান্না শুধু পাদরীর ঠাকুরমায়ের নয়। ঘরে ঘরে চাপা কান্না শুনতে পাবেন। জানেন তো বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যাদের হিম্মত আছে, যারা প্রতিবাদ করার মত মনোবলের অধিকারী যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাদের জন্য মৃত্যুদণ্ড অলক্ষ্যে ঝুলছে। সে যে কোন পার্টির-ই হোক না কেন, মৃত্যু, অবমাননা, অপমান ও লাঞ্ছনার হাত থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। শাসক দলের লোক যদি শাসকের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মাথা তুলতে চেষ্টা করে তারও যা গতি, বিরোধী দলের কেউ দুর্নীতির বিরুদ্ধে মাথা তুলতে চেষ্টা করলে তারও সেই গতি। পাদরী কিন্তু কোন দলের নয়। তার একমাত্র প্রার্থনা ছিল তার ঠাকুরমার দুটি আহার্য পাবার।

ভারতী ধরা ধরা গলায় বলল, হাকিম ভাই। বাদা এসে অবধি একই চিত্র দেখছি। আমার মনে হয় সুন্দরবনের অর্থবান মানুষ মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে জানোয়ারের পর্যায় এসে গেছে। এ থেকে মুক্তি পেতে শোষিত মানুষরা আকুলি-বিকুলি করছে। কিন্তু তা বুদবুদের মত, সামান্যক্ষণ, তারপরই সব সমান্তরাল, নিথর, শীতল, প্রাণহীন। কেন?

বাঁচার অধিকার আদায় করার মত শিক্ষা এদের কেউ দেয় নি। বরং বিভ্রান্ত করেছে এদের। সঠিক পথের সন্ধান দেবার দায়িত্ব যাদের তাদের অধিকাংশই স্বার্থসিদ্ধি ঘটাতে এদের ব্যবহার করেছে। নেতৃত্ব দেবার লোকের বড়ই অভাব।

বললাম, হুঁ।

মানে?

মানে, বুঝলাম। অনেক রাত হয়েছে। এবার শয্যার আশ্রয় নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

বিছানায় শুয়েও শান্তি পাচ্ছিলাম না। তখনও পাদরীর ঠাকুরমায়ের কান্না ভেসে আসছিল বাতাসে ভর করে। কিন্তু কাঁদার তো শেষ হবে না, সেই অনন্ত জিজ্ঞাসার মত সমাধান খুঁজে বেড়ানোই সার হবে, শেষ আর হবে না। সমস্যা চিরকালের সমস্যা হয়েই থাকবে। কতশত মায়ের অশ্রুতে সিক্ত হয়েছে মাটি মায়ের বুক, কতশত সন্তানের শোনিতে রঞ্জিত হয়েছে মাটি মায়ের আঁচলে তার হিসাব নেই। এমনি ভাবে মানুষের মাটির ক্ষুধা মেটাতে ধর্মের নামে,

অর্থের নামে, রাজনীতির নামে, সমাজনীতির নামে যুগে যুগে নরহত্যা, ব্যভিচার, অনাচার, অত্যাচারের প্লাবন বয়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। অথচ আমরা সভ্যতার দাবীদার, মানবতার জন্য কুম্ভীরাশ্রুপাত করি। মানব মুক্তির জন্য বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-দর্শন-কোরাণ-বাইবেল-আবেস্তা লিখেছি গাদা গাদা। উদ্দেশ্য মানব মুক্তির নয়, উদ্দেশ্য নীতিধর্মের গালভরা কথা শুনিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে সভ্যতাকে বলাৎকার করতে।

পাশ ফিরে শুতেই ভারতীর দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল।

তুমিও ঘুমোও নি?

ভারতী শুধু হাসল।

তার মুখের চেহারা দেখতে পাই নি। মনে হল, পার্থিব সব কিছুকে ব্যঙ্গ করে মৃদু একটি হাসি আমার কানে কানে বলে দিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানবতার দোহাই হল ভণ্ডামি আর বাটপাড়ি। এই ভণ্ডামির ও বাটপাড়ির চেহারা দেখতে পেলাম গ্রামে-নগরে, প্রশাসনে-শাসনে, সমাজে-রাষ্ট্রে। এর শেষ কোথায়?

ভারতী জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছ?

ভাবছি, এই কান্নার নিবৃত্তি কি করে ঘটবে।

ঘটবে। ঘটাবার মত ত্যাগ, নিষ্ঠা, সাধনার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত হচ্ছে। নিকট ভবিষ্যতেই এর নিবৃত্তি ঘটবে এটাই আমাদের আশা।

তোমার আশা পূর্ণ হোক। বলেই আবার পাশ ফিরে শুলাম।

সৌরজগতে নিয়মমত সকাল সন্ধ্যার উদ্বোধন হয়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে ঘড়ির কাঁটাটা নির্মমভাবে এগিয়ে গেছে। চোখ খুলতেই বুঝলাম অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে শয্যা ত্যাগ করতে। ভারতী স্নানে গেছে, ইসুফ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে চা সদ্ব্যবহার করছে। চোখ ডলতে ডলতে উঠেই বললাম, তোমরা আমাকে ডাকনি কেন? অনেক বেলা হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রাম শেষ করতে পারব না দেখছি।

ইসুফ বলল, আপনাকে ডাকতে মানা করেছি দাদা। মনে হচ্ছে, আপনি খুব ক্লান্ত।

চোখে মুখে জল দিতে দিতে বললাম, শারীরিক নয়, মানসিক। তোমার দিদি কোথায়?

পুকুরে স্নান করতে গেছে।

তুমি স্নান করেছ কি?

এখনও সময় হয়নি। রাস্তায় বের হবার আগে স্নান করব। আপনি চা খেয়ে স্নানাদি করে নিন।

আমার চা খাওয়া শেষ হবার আগেই ভারতী ফিরে এল। ভেজা চুল ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, আজ আমাদের রিটার্ণ জার্নি শুরু। এবার অন্য পথে যাব মনে করেছি। হাকিম ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করেছি ঝাড়খালিকে বাঁপাশে রেখে আমরা মণি নদী পেরিয়ে ওপারে যাব। প্রস্তুত হও। ভাতে ভাত রান্না শেষ। তুমি তৈরি হলেই হল।

নদীর ঘাট অবধি এল হাকিম আলি ও তার স্ত্রী। আমরা ফেরি নৌকার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এখানে নদীর চেহারা ভয়ঙ্কর। ওপারে ঝাড়খালির চর। কত বড় চর তা আন্দাজ করা যায় না। এই ঝাড়খালি একসময় সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠাকে ধন্য করেছিল। সুন্দর অথবা সুন্দরী নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা। তার জন্য কত হাজার টাকা ব্যয়। এসব শুনেছি, সংবাদপত্রে পড়েছি কিন্তু সাহস করে নদী পেরিয়ে ওপারে যাইনি। একটি সুন্দর অথবা সুন্দরীর দেশ ওটা নয়, আরও কিছু সুন্দর অথবা সুন্দরী ওখানে বিরাজ করে নিশ্চয়ই। বন বিভাগের লঞ্চ বিনা নিরাপদে চলাফেরা করার উপায়ও নেই। একমাত্র মোষের পিঠে চেপে নদী অতিক্রম করা সম্ভব।

হাকিম আলি বলল, বর্তমানে এটা শুধু বাঘের রাজ্য নয় দাদা। তার চেয়েও ভয়ঙ্কর মানুষের বাস এই অঞ্চলে।

বললাম, মানুষ তো চিরকালই ভয়ঙ্কর। নতুন কোন ঘটনা নয়।

এখান থেকে পাকিস্তান সীমানা খুব দূরে নয়। বর্তমানে বাংলাদেশ নামেই পরিচিত। পাকিস্তান থেকে নদী পথেই চোরাই চালানের এগুলো ছিল ছোটখাট ঘাঁটি। এখনও অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি, বরং অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। নৌকায় চোরাই মাল আসে বাংলাদেশ থেকে। চোরাই চালানদারদের নৌকা সব সময় নিরাপদে এখানে পৌঁছতে পারে না। ভয়ঙ্কর মানুষের দল ছোট ছোট নৌকা নিয়ে চোরাই চালানের নৌকা ঘেরাও করে, লুট করে। চোরাই চালানদাররাও খুব বোকা নয়। তারাও বেশ অস্ত্রসজ্জিত থাকে। এর ফলে নৌযুদ্ধের মহরা দেখা যায় অনেক সময়। নদীপথের ডাকাতরা অনেক সময় জয়লাভ করে। ডাকাতরা চোরাচালানদারী নৌকার মাঝি ও যাত্রীদের খুন করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। আবার কোন সময় ওরা হার মেনে

ডাঙ্গায় নৌকা ভিড়িয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। সুন্দরবনের বাঘের চেয়েও হিংস্র সুন্দরবনের ডাকাত।

সীমান্তে পাহারাদার তো আছে।

তারা তো অংশীদার। বখরা থাকে। ওরা চোরাই চালানদারদের কাছ থেকেও যেমন হিস্যা পায় তেমনি পায় ডাকাতদের কাছ থেকে। যারা ডাঙ্গায় বিজয়ী হয়ে নৌকা ভেড়ায় তারাই ওদের খুশী করে। চোরাই চালান অবাধ গতিতে চলে।

এরা মাল বিক্রী করে কোথায়?

এদের মাল জমা থাকে অনেক খ্যাতনামা দেশনেতার গুদামে। তারা আবার ছোট ছোট লটে মাল পাচার করে কলকাতার বাজারে। কলকাতার ফুটপাতে যে সব দোকান আছে তার একটা গণনীয় অংশই এই সব চোরাইমালের কারবার করে। এমন অনেক বিত্তহীনকে পাবেন যারা চোরাই চালানের দৌলতে গত বিশ বাইশ বছরে গ্রামে পাকাবাড়ি করেছে, বহু জমিজমার মালিক হয়েছে। এরা খুশী রাখে পুলিশকে, খুশী রাখে প্রশাসনকে। অকাতরে টাকা ব্যয় করে এদের খুশী রাখতে। ভোটের বাজার গরম হয় এদের টাকায়। এরাই হল সরকারের মূল স্তম্ভ। এদের গায়ে কারও ছোঁয়াও লাগে না। এরা চোরাই মালের মার্কেট তৈরি করে, চোরা চালানদারদের আর্থিক সাহায্যে দেয়, আবার ভদ্রবেশে সমাজের ভালমন্দের বিধাতা সেজে গরীব মানুষদের ওপর অত্যাচার করে।

ভারতী জয়াবতীর হাত ধরে কিছুটা দূরে একটা খড়ের চালার নিচে দাঁড়িয়েছিল। খড়ের চালার নিচে একজন দর্জি জামা সেলাই করছিল। দর্জির সঙ্গে বেশ জমিয়ে গল্পও করছিল। খেয়ার নৌকা তখন ওপারে। বিলম্ব হবে এপারে আসতে।

হাকিম আলি ঘাটের কাছেই আরেকটা খড়ের চালার দিকে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে কাঁচের গেলাসে করে চা নিয়ে এল।

একটু চা খেয়ে নিন। আর কখনও এই দুর্গম এলাকায় আপনাদের পায়ের ধুলো পড়বে কিনা জানি না। যদি কখনও আসেন তা হলে এই ভাইটির কথা মনে রাখবেন।

কোন উত্তর না দিয়ে চায়ের গেলাস হাতে নিয়ে হাসলাম। এই রকম অনুযোগ ও অনুরোধ শুনতে শুনতে আমি গোটা দেশটা ঘুরেছি। একবার যাকে

ছেড়ে এসেছি তাকে কখনও হয়ত ফিরে পাইনি। এদের প্রত্যেকেই একটা না একটা ছাপ রেখে দিয়েছে মনের কোথায়। তাতে বাস্তব কোন বোধ সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। অনন্তকাল ধরে মানুষ আসছে যাচ্ছে, যাওয়া আসার পথে পদচিহ্নটুকুও কেউ রেখে যাচ্ছে না। তবু মানুষ চায় একজন অপর জনকে মনের নিভৃতে আশ্রয় দিয়ে মাঝে মাঝে স্মরণ করবে। হাকিম আলিও তাই চায়।

হাকিম আলির কাছে অনেক কিছু পাওয়ার তো আশা নিয়ে আসিনি, এসেছিলাম পরিবেশকে জানতে, পরিবেশের একজন হয়ে নিজেকে ভাবতে।

খেয়া নৌকাটা ঘাটে পৌঁছতেই এগিয়ে গেলাম। খেয়া ভর্তি না হলে পাটনী নৌকা ছাড়বে না। হাকিম আলিও এসে উঠেছিল নৌকাতে। তার অনুরোধে পাটনী অন্য যাত্রীর অপেক্ষা না করে আমাদের নিয়েই খেয়া জমাল।

ভারতী জিজ্ঞাসা করল, এবার কোথায় তোমার হল্টিং স্টেশন।

জানি না। এবার জয়াবতীর নির্দেশে আমাদের চলতে হবে।

জয়াবতী খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল, ওপারে পথ দেখিয়েছি এপারে অচেনা পথ।

মানুষ?

মানুষ কেউ চেনে? যে বলে মানুষ চিনি সে মিথ্যা কথা বলে দাদা। হাকিম ভাইয়ের বউ ঠিক এই কথাই কাল রাতে বলছিল।

কেন?

অল্পবয়স, আমার চেয়েও ছোট। আঘাতে আঘাতে শক্ত হয়ে গেছে। লড়াই করা জীবন তাই কঠিন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। তার অভিজ্ঞতার কথাই বলছিল। বলছিল মানুষ চেনা যায় না দিদি। মানুষ যদি চিনতে পারতাম তা হলে এই জীবন যাপন করতে হত না। সকালবেলায় ঘাটে যাবার পথে তোমাকে দেখিয়েছি যে লোকটাকে সে আমার জ্যাঠা। আমার বাবা থাকে হুগলীতে। বাবা আমাকে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করেছিল। লেখাপড়া শিখতে যাওয়াটাই হল কাল।

তারপর!

জ্যাঠা তার বড় ছেলেকে পাঠাল বাবার কাছে। স্কুলে পড়ত আর দর্জির কাজ শিখত। ছোটবেলা থেকে জ্যাঠার ছেলে বেলায়েতের সঙ্গে আমার ভাব জমেছিল। আমি বড় হলাম। বেলায়েত জ্যাঠার কাছে ফিরে এসে হাটতলায়

দর্জির দোকান করল। জ্যাঠার অবস্থা খারাপ নয়। চাষের জমি চল্লিশ বিঘে আছে, আমার বাবার অংশও জ্যাঠা চাষ করে। বছরে দু একবার বাবা আসত, ধানের বদলে নগদ টাকা নিয়ে যেত। আমি কখনও এদিকে আসিনি। বেলায়েত মাঝে মাঝে হুগলীতে যেত। শেষ পর্যন্ত বেলায়েত আমার বাবার কাছে প্রস্তাব দিল। বলল, আমি খুকিকে বিয়ে করব। বাবার অমত ছিল না। বেলায়েত আমাকে বিয়ে করল।

তারপর!

জয়াবতী হেসে বলল, পরে অনেক আছে। হাকিমের স্ত্রী বলেছিল, বেলায়েত আমাকে বিয়ে করেছিল জ্যাঠার অনুমতি না নিয়ে। জ্যাঠা রেগে গেল। কিছুতেই আমাকে পুত্রবধূ বলে মেনে নিতে স্বীকার করল না। বেলায়েত পড়ল বিপদে। সব কথাই সে আমাকে বলত, দু'জনে পথ খুঁজতাম। বেলায়েত দুর্বল চিত্তের লোক। বাপের একমাত্র পুত্র। সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার ভয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে। তারপর একদিন বেলায়েত ফিরে গেল তার বাবার কাছে। কি সব শলা-পরামর্শ হল। শেষে পাঁচজনের সামনে আমাকে তালাক দিল।

তারপর!

মুসলমান ধর্মে এমন অধর্মের অনুমোদন আছে বলে শুনিনি। আমার একটা স্বপ্নময় জীবন ব্যর্থ করে দিল ষোল বছর বয়স না হতেই। অথচ জ্যাঠা এখানে মুসলমানদের জন্য একটি মসজিদ তৈরি করে দিয়েছে। পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে বোধহয় মসজিদ তৈরি করেছে। কিন্তু যে পাপ সে করেছিল তা থেকে ওর মুক্তি নেই। আমি অসহায়। কোথায় যাই। বাবাও বিরূপ। এমন সময় হাকিম আলির সঙ্গে পরিচয়। তাও আরও চারটি বছর আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে নতুন এই ঘর পেতে। না, শরীয়ত অনুসারে আমরা বিয়ে করিনি, আমরা সিভিল ম্যারেজ আইন অনুসারে বিয়ে করেছি, যাতে 'তিন তালাক' বললেই ভালবাসা-স্নেহ-মায়া-মমতা নস্যাৎ না হয়ে যায়।

তাই বলছিলাম, কাউকে চেনা যায় না। নিজের জ্যাঠা আমার প্রথম জীবনের ওপর যে ঘোরতর আঘাত করেছিল তা কল্পনা করতে পার কি দিদি! আর বেলায়েত? যে সোহাগে আহ্লাদে আমাকে বেহস্ত ঘুরিয়ে আনতে বারবার বীরত্ব দেখিয়েছিল, সেই বেলায়েত সম্পত্তির লোভে নিজেই দোজখে নেমে যেতে ইতস্তত করেনি।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কেমন আছে?

জয়াবতী বলল, খুব ভাল আছে। বলল, আল্লার হাত থেকে তো বেঁচেছি।

মানে?

মানে আমি জানতে চেয়েছিলাম। সে বলেছিল, আল্লা আর ভগবানের নামেই তো এই সব অত্যাচার আমাদের সহ্য করতে হয়। এখন আল্লা অথবা ভগবানের নামও করি না, দরকারও হয় না। সেইজন্যই অত্যাচারও সহ্য করতে হয় না। হাকিম আলি বলে, মানুষকে শোষণ আর পেষণ করতে দুষ্ট কায়েমী স্বার্থের মানুষ ভগবানকে মনে মনে সৃষ্টি করে দুঃখী মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল বলেই এত অশান্তি-অত্যাচার সহ্য করে দুঃখী মানুষরা। সে বলল, আমি বলি কি সংসারের অনেক কাজ করতে তো হয়, অকাজ করে কেন সময় নষ্ট করব। তার চেয়ে এই ভাল, আমরাও ভাল আছি।

আমি জয়াবতীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে বললাম, হুঁ?

অমন করে 'হুঁ' বললেন কেন দাদা?

পরিমিত জ্ঞানের অভাব থাকলেও নির্ভুল পথেই পা দিয়েছে সস্ত্রীক হাকিম আলি।

ওপারে পৌঁছে জয়াবতী বলল, আমরা যাব ধীরানন্দের বাড়িতে। বেলা অনেকটা হয়েছে। হয়ত সংবাদ সে জানে, তবুও সময়মত হাজির হতে পারলে ভাল হত।

ধীরানন্দের বাড়ি এখান থেকে কত দূর?

তা মাইল তিনেক তো হবেই। বিকেলের মধ্যে পৌঁছে যাব। আজ রোদের জ্বালাটা যেন বেশি। বসন্তের বাতাসে শীতের নাভিশ্বাস এসেছে, গাছ থেকে পাতা ঝরছে, গরম বাতাস খোলা মাঠগুলোকে যেন পুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের কষ্ট হবে। আমরা তো চাষার মেয়ে, রোদ বৃষ্টি সবই আমাদের সহ্য হয়, আপনাদের তো সহ্য হবে না।

সত্যি সত্যি মাইলটেক যেতে না যেতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম।

ছোট্ট একটা গ্রাম।

গ্রামের প্রবেশ পথে ছোট্ট একটা গির্জা। অধিবাসীরা আদিবাসী বলেই মনে হল। গির্জার পাশে কবরখানা। কবরখানার পাশাপাশি অনেক মৃতদেহ সমাহিত করা হয়েছে বছরের পর বছর ধরে। নতুন কবরগুলো নিকিয়ে পরিষ্কার করা। তার ওপর বাকারি দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন। দু তিনটে কবরের ওপর

ইটবাঁধানো বেড়, তাতে অনেক গুণকীর্তন করা রয়েছে মৃতের সম্বন্ধে। গ্রে সাহেবের 'এলিজি' কবিতার কথা মনে পড়ল। সবাই শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। পরিবেশ শান্ত, পাশে গির্জায় ঘণ্টা বাজলে প্রিয়জনের কবরগুলো দেখতে ছুটে আসে অনেকে। বনজাত নানা জাতের নানা রং-এর ফুল দিয়ে সাজায় এইসব কবর। তারপর চুপচাপ সবাই। মৃত্যু যাদের শেষ গতি তাদের জীবমানকালের অহমিকার সামান্য রেশও নেই এইসব কবরে, শুধুমাত্র যারা অর্থবান তাদের অর্থের জৌলুষ দেখাতে কয়েকটি কবরে ইঁটের বেড় দেওয়া হয়েছে।

আমি দাঁড়িয়ে গেলাম কবরখানায়।

জয়াবতী পাশে এসে জিজ্ঞেস করল, কি ভাবছেন দাদা?

না, কিছু না। আচ্ছা জয়াবতী ভগবান যদি সবার এক হয় তা হলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মতের স্ফুরণ ঘটত কি কখনও? কোথায় যেন বিরাট একটি প্রতারণা রয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রতারণা হল ভগবানের নামে মানুষের ওপর অত্যাচার অবিচার করা।

এখানে অত্যাচার ও অবিচারের কি দেখলেন?

গরীবের কবরগুলো দেখছ, পাশে অর্থবানের কবরগুলো দেখ। পার্থিব শ্রেণী বৈষম্যকে ওরা মৃত্যুর পরও বজায় রেখেছে এই তো মনুষ্যত্বের প্রতি নির্মম অবিচার।

ভারতী আমার হাত ধরে বলল, আর দরকার নেই। চল।

চলেছি।

গ্রামের চেহারা চোখে পড়ল।

সামনে দলগোড়া।

গ্রামের প্রবেশ পথেই দুটো টালিতে ছাওয়া মন্দির। একটা গাজীর অপরটি দক্ষিণরায়ের।

ইসুফ বলল, সুন্দরবনের প্রবেশ পথ। এখান থেকে সিন্নি আর মানত দিতে দিতে মধু আহরণকারী আর কাঠুরের দল এগিয়ে চলে সুন্দরবনের গভীরে।

এর আগেও যে সব মন্দির দেখেছি এ দুটোও সেই রকমই। এর মধ্যে নতুনত্ব নেই, আড়ম্বরও নেই। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রাণের

মায়া পরিত্যাগ করে যে সব দরিদ্র অর্ধাহারী অত্যাচারিত মানুষ বাঘের মুখের দিকে এগিয়ে যায় তাদের কথা ভাবতে শিউড়ে উঠতে হয়।

বললাম, যারা মধু সংগ্রহ করে এবং কাঠুরে তাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে কি? এমন দু-একজনের সঙ্গে পরিচয় করার ইচ্ছা রয়েছে।

জয়াবতী বলল, ওদের খুঁজতে হবে না। ধীরানন্দই ডেকে আনতে পারবে।

বাদার অন্যান্য গ্রামের মত চেহারা নয় এই গ্রামের। বিচ্ছিন্ন নয়। এক এক পাড়ায় এক একটি সম্প্রদায়, পাড়ার শেষে মুসলমানদের বাস, গ্রামের মাঝ দিয়ে অলিগলি। মোটামুটি সম্পন্ন লোকের বাস খুব কম নয়। আমরা অলিগলি পেরিয়ে গ্রামের শেষ প্রান্তে ধীরানন্দের গৃহ আবিষ্কার করলাম।

ধীরানন্দ আমার অপরিচিত কিন্তু আমি উঠোনে পা দিতেই সহাস্যে এগিয়ে এল ধীরানন্দ। তখন সে উঠোনে সেদ্ধ ধান পা দিয়ে রোদে ছড়িয়ে দিচ্ছিল, এমন সময় আমরা উপস্থিত হয়েছি। ধীরানন্দের পরণে গামছা, উর্ধাঙ্গে ছেঁড়া একটা গেঞ্জি, মাথায় আরেকটি গামছা বাঁধা। তার চেহারা ও পরিবেশটা ভালই লাগছিল। উঠোনের একপাশে তার রান্নাঘরের বারান্দায় বসে তার পুত্রবধূ তখন আনাজ তরকারি কেটে রান্নার ব্যবস্থা করছিল।

ধীরানন্দ বলল, আপনারা আসবেন জানি কিন্তু কখন আসবেন তা জানি না বলে ঠিক প্রস্তুত হতে পারিনি। ওরে অতুল, ওরে শ্যাম, না, কেউ নেই দেখছি।

ধীরানন্দের মেয়ে অনিমা এসে বলল, দাদারা মাঠে গেছে।

ও, তুই যা তো অনিমা। পাশের পুকুরটা শুকিয়ে এসেছে। ওটা সেঁচতে বলেছিল তোর অমিয়কাকা। আজ তোর দাদাদের বল সেঁচ দিতে।

বক্তব্যটা খুবই সাদাসিধা হলেও অর্থটা যে গূঢ় তা জেনেছিলাম পরে।

অমিয় ভাণ্ডারী অর্থবান লোক। তার শুষ্কপ্রায় পুকুর সেঁচতে পারলে মজুরি হিসাবে অর্ধেক মাছ পাবে ধীরানন্দের ছেলেরা। আজ অতিথি সেবার ব্যবস্থা করতে হবে সেজন্য ধীরানন্দ ছেলেদের নির্দেশ দিল পুকুর সেঁচতে।

অতুল ও শ্যাম ঘণ্টা খানেক বাদে একটা ছোট টুকরি ভর্তি পুঁটি চিংড়ি ছোট ছোট কই মাছ নিয়ে উপস্থিত হতেই ঘটনাটা পরিষ্কার হল আমাদের কাছে।

ধীরানন্দের গৃহের অবস্থা দেখে মনে হয়নি, চারজন অতিথির আপ্যায়ন

করার সামর্থ্য তার আছে। এই দরিদ্র অবস্থার মধ্যে আমাদের যে ভাবে সেবা করল তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

খাওয়ার পর বারান্দায় কাঁথা পেতে দিয়ে ধীরানন্দ বলল, বিশ্রাম করুন।

বললাম, তা করছি। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা জেগেছে মনে।

নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবেন। বলুন কি জানতে চান?

আপনার অবস্থা দেখে আমার মনে হচ্ছে, এই গোটা পরিবারকে সারা বছর ধরে দুবেলা খেতে দিতে আপনার খুবই অসুবিধা হয়।

ধীরানন্দ চুপ করে একটা বিড়ি বের করে আগুন দিল। অনেকক্ষণ নিবিষ্ট মনে বিড়ি টানতে টানতে বলল, কথাটা ঠিকই। ছয় মাসের খাবার সংস্থান হয় না।

বাকি ছয় মাস?

গত বছর আমার স্ত্রী আর বড় মেয়েকে বালিগঞ্জে পাঠিয়েছিলাম। একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে ঝি-গিরি করেছে, মেয়েটা ছেলে রাখার কাজ করেছে। তাতে দু'জনের খাবার সমস্যা কমেছিল, ওরা কিছু কিছু নগদ টাকাও পাঠাত। ছেলেরা বাউলি বাজারে মুটের কাজ করেছে। বাড়িতে ছোট ছেলে, ছোট মেয়ে, বউমা আর আমি। সামনের এই যে আড়াই কাঠা জমি, এই জমিতে শাক-তরকারি লাগিয়েছিলাম। তাতে বাড়ির খাবারটা পাওয়া গেছে। এবার আবার পুরানো অবস্থা দেখা দেবে মনে হচ্ছে। আবার ওদের বালিগঞ্জে পাঠাব মনে করেছি।

আপনার চাষের জমি নেই।

জমি বলতে এই বাস্তু আর সামনের আড়াই কাঠা। এবারে লাউ লাগিয়েছি। ফলও হচ্ছে। আশা করছি, এবার লাউ বিক্রি করে কিছু হবে। তবে এখান থেকে শহরে নিয়ে যাওয়া তো সহজ কথা নয়। সেজন্য দাম খুব একটা পাওয়া যাবে না।

অন্য কোন চাষ নেই?

না। এখানকার ক্যাশ ক্রপ হল লঙ্কা। যাদের জমি আছে তারা লঙ্কার চাষ করে। গত বছর অনেকে লঙ্কার চাষ করে সারা বছরের খরচ তুলেছে। আমার মত যারা তাদের তাতে কোন পরিবর্তন হয়নি। আপনি যদি মাঠে যান, দেখতে পাবেন লঙ্কা চাষের হিড়িক পড়েছে। কাঁচালঙ্কা বস্তাবন্দী হয়ে কলকাতায় যায়। আবার শুকনো লঙ্কারও চাহিদা আছে। তবে এখানকার শুকনো লঙ্কা খুব ভাল হয় না।

এই তো আপনার উঠোনে ধান। জমি না থাকলে ধান পেলেন কি করে!

কেনা ধান। রোজ দু'মণ ধান সেদ্ধ করি। ছেলেরা ধান ভানাই করে। সেই ধান থেকে বাড়ির খাবারের চালটা পাই, বাকিটা বিক্রি করে মূলধন ঠিক রাখি। তবে এ ব্যবসা আর চলবে না। নদী পেরোতে খুবই কষ্ট। পুলিশের হাঙ্গামা হচ্ছে খুবই।

ধীরানন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, আপনি দেখতে পাবেন এক একজন জোতদারের ঘরে পঞ্চাশটা ষাটটা ধানের গাদা। তারা লেভির ধারও দেয়নি কিন্তু যারা মেহনত করে ধান ভানাই করে অন্ন সংস্থান করে তাদের ওপর জুলুম। আমাদের তো লাভ বিশেষ কিছু থাকে না, তবে দু'মণ ধান ভানলে মূলধনটা ফিরে আসে আর দুবেলার খোরাকটা হয়। তাও সরকার হতে দেবে না। যারা কালোবাজারী মজুত করে, তাদের ওপর সরকারের অসীম দয়া। শুধু যারা মেহনত করে সৎভাবে অন্ন সংস্থান করতে চেষ্টা করে তাদের ওপর সরকার নারাজ।

ধীরানন্দ বলতে থাকে।

এই যে বাঁচার চেষ্টা করছি এতে কৃতিত্ব কতটা আছে জানি না কিন্তু আমাদের মারার চেষ্টা কেমন হচ্ছে সেটাই আপনাকে বলব।

আমি বামপন্থী দলের সমর্থক।

আমার মত শত শত সমর্থক আছে এই গ্রামে। যারা কালোবাজারী করে, শোষণ করে তাদের হাতে ক্ষমতা। তারা আমাদের সহ্য করবে কেন? তারা নানা ভাবে অত্যাচার করছে অথচ প্রতিকার নেই। গরীব মানুষের স্বপক্ষে কেউ কোন কথা বললেই তাকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়, অনেক সময় প্রাণহানিও ঘটে।

ভাগচাষী উচ্ছেদ আরম্ভ হল। সরকারী আইনে ভাগচাষীদের উচ্ছেদ বে-আইনি কিন্তু শতকরা পঁচিশ ভাগ শস্যের বদলে ভাগচাষ মঞ্জুর করতে জোতদাররা মোটেই রাজি নয়। যারা পুরাতন ভাগচাষী তাদের উচ্ছেদ করে গোপন ব্যবস্থায় নতুন ভাগচাষীকে চাষ করতে দিলে আধা-আধি ভাগ।

জোতদাররা লিখিত ভাবে ভাগচাষের অধিকার দিতে আইন মোতাবেক বাধ্য। অনেক ভাগচাষী যুক্তফ্রন্টের আমল হারাতেই জোতদারদের চেহারা বদলে গেল। এবার তাদের সরকার। তাদের কাজে প্রতিবাদ করার সাধ্য কারও নেই। যারা প্রতিবাদ করবে অথবা আন্দোলন করবে তাদের শায়েস্তা করতে

পুলিশ সব সময়ই এগিয়ে এসেছে। পুলিশের তথা সরকারের পরোক্ষ সাহায্যে জোতদাররা নতুন পথ নিল।

ভাগচাষীদের দু'জন একজন করে ডেকে এনে গুন্ডাদের হাতে তুলে দিতে আরম্ভ করল। প্রকাশ্যে এবং দিবালোকে ভাগচাষীদের ওপর শারীরিক অত্যাচার করে জবরদস্তি ইস্তফা লিখিয়ে নিতে আরম্ভ করল। যারা সহজে ইস্তফা লিখতে চায় নি তাদের ওপর যে বর্বর অত্যাচার হয়েছে ও হচ্ছে তার নজীর কোথাও পাবেন না।

যারা অত্যাচার সহ্য করেও ইস্তফা দেয় নি তাদের তুলে দেওয়া হচ্ছে পুলিশের হাতে। আমাদের দেশে তো আইনের ঘাটতি নেই। নানা আইনের নানা ধারায় জড়িয়ে পাঁচ-সাতটা মামলায় এদের চালান করা হয়েছে ও হচ্ছে আদালতে। কেউ কেউ জামিন পেলেও গরীব চাষীদের জন্য জামিনদার পাওয়া যায় নি। তারা হাজতে পচছে। এই অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করছে ও দেশের ভূমিহীন ক্ষেত-মজুর আর ভাগচাষী।

আর সরকার নির্বিকার। আইন আছে। তার প্রয়োগ তো হয় না। অপপ্রয়োগ হচ্ছে প্রতি নিয়ত। আমরা হলাম এই অত্যাচারের ছাগ-শিশু, হাড়িকাঠে ফেলছে আর গলা কাটছে। সমাজতন্ত্র আর গরীবি হটাবার এমন নিদর্শন অন্য কোন দেশে আছে কিনা জানি না। তবে সমাজতন্ত্রের নামে শোষণতন্ত্র আর গরীব হটাবার মহান কার্য করছে বর্তমান সরকার। কথা বলার উপায় নেই। কথা বললেই গলা কাটা যাবার সমূহ সম্ভাবনা।

এই ভাবেই বেঁচে আছে বাদার মানুষ। খরা বন্যায় লাইন দিয়ে ছোটে কলকাতা শহরে। কেউ মহামারীতে মরে, কেউ মরে অনাহারে। সরকারী খাতায় লেখা হয় অপুষ্টিজনিত কারণে মৃত্যু। একশত বৎসরের এই হল বাদার ইতিহাস। বর্তমানে ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি কলঙ্কিত অধ্যায় লেখা হচ্ছে।

বললাম, এটা তো শুধু বাদার চাষীদের দুর্ভাগ্য নয়, গোটা ভারতের এই চিত্র। এর সঙ্গে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত।

কিন্তু প্রতিকার কোথায় দাদা? আমরা যেন ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছি। আমরা সমাজবিরোধী গুন্ডাদের হাতে নিজেদের সমর্পণ করে বাঁচতে চাই না, তবুও বাঁচতে হচ্ছে। আশার পর আশা আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে

কোন অজ্ঞাত অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তাও বুঝতে পারছি না। সন্ধ্যাবেলায় এখানে গ্রামের কয়েকজন গরীব চাষীকে ডেকেছি। তাদের মুখেই সব শুনতে পাবেন।

জয়াবতী আর ভারতী এতক্ষণ ধীরানন্দের স্ত্রী ও পুত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিল। তাদের আলোচ্য বিষয় বস্তু আমি জানি না। হঠাৎ ভারতী উঠে এসে বলল, বেলা তো গড়িয়ে এল, চল এবার গ্রামটা ঘুরে দেখে আসি।

ধীরানন্দ বলল, অবশ্যই। বাদায় এই রকম আঁটো-সাঁটো গ্রাম খুব কম আছে। তবে দেখবার মত বিরাট কিছু নেই। পুরাতনের মধ্যে কয়েকটা শিবমন্দির আছে। সেগুলো নোনা ধরে শেষ হয়ে আসছে। একশত বছরের বেশি তাদের বয়স নয়। সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে ইঁটের বাড়ির স্থায়িত্বও বেশি নয়। আর দেখতে পাবেন কয়েকজন অর্থবান ব্যক্তির জৌলুস আর শতশত অনাহারী ও অর্ধাহারী মানুষের ভাঙ্গা ঝুপড়ি।

সবাই প্রস্তুত হয়ে নিলাম গ্রাম পরিক্রমার জন্য।

পথ চলতে চলতে বহুজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। অবাক হয়ে দেখছিলাম অপসংস্কৃতির কুৎসিত চেহারা কি ভাবে এই বাদার অজগ্রামে প্রসার লাভ করেছে। যারা মোটামুটি সঙ্গতিসম্পন্ন তাদের বাড়ির ছেলেরা যেমন জুলপি-বাবরির হাট বসিয়েছে তেমনি তাদেব ঘরের মেয়েরাও ছয় ইঞ্চি ঝুলের ব্লাউজ ও জুলপি ও অবিন্যস্ত চুলের বাহার দেখিয়ে বেড়াচ্ছে।

ধীরানন্দ একবার জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছেন দাদা?

না, ভাবছি না। দেখছি। যা দেখছি তা চিন্তা ভাবনার বাইরে। বাংলা একদিন পথ দেখিয়েছে সারা ভারতকে, প্রশংসা অর্জন করেছে তার অভিনবত্ব ও প্রগতিশীলতার জন্য। আজও বাংলা পথ দেখাচ্ছে সারা ভারতকে, অর্জন করছে ঘৃণা আঁর অবহেলা। ভাবছি, এমন একটা স্টেজে আমরা এসেছি যেখানে এগিয়ে চলার কোন ইঙ্গিত না পেয়ে পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছি। আচ্ছা ধীরানন্দবাবু, আপনার পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতায় বাদায় এই অপরূপ অপসংস্কৃতির প্রাবল্য কখনও চোখে পড়েছে কি? পুরুষরা মেয়েদের সাজ পড়েছে, মেয়েরা স্তনের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, অর্থাৎ যৌন লালসাকে উদ্দীপিত করার এমন সমারোহ কখনও কি দেখেছেন এই সব গ্রাম্য পরিবেশে?

ধীরানন্দ শুধু হাসল।

জয়াবতী চোখমুখ লাল করে বলল, এই যুবসমাজকে বাঁচাতে হবে দাদা।

এ যে শিবের অসাধ্য বোন। যে বিষ খায় তার বিষ উদ্গীরণ করানো কি এত সহজ। বিষে বিষে ওদের দেহ ও মনে পচন ধরেছে, এমন কোন ধন্বন্তরীর সন্ধান কারও জানা নেই এদের রক্ষা করার। যে টুকু পথ ছিল তাও বন্ধ করেছে রাজনীতির জুয়ারীর দল। একদল ইয়াঙ্কি সভ্যতাকে সমর্থন করছে কোন একটি দেশের সমাজতন্ত্রের সোল এজেন্ট সেজে। ইতিহাসের শিক্ষা ভুলে যেও না। যারা জাহান্নামে যায় তাদের সর্বাগ্রে বুদ্ধিনাশ হয়। এদের মগজ ধোলাই হয়ে গেছে, এদের বিনাশ নিশ্চিত। সেই শুভক্ষণের জন্য আমরা প্রতীক্ষা করছি।

চলতে চলতে নদীর কিনারায় গিয়ে বসলাম।

এখানে মিঠে রোদের সঙ্গে নদীর বুক বেয়ে যে মিঠে বাতাস বয়ে বিকেলের মিঠে রোদের সঙ্গে নদীর বুক বেয়ে যে মিঠে বাতাস বয়ে আসছে তারই আমেজে চোখে যেন ঘুম নেমে আসছিল। আমি দেখছিলাম নদীর বুকে ছুটে চলেছে পালতোলা নৌকা, আশেপাশে ভাসছে ছোট ছোট ডিঙ্গি। ডিঙ্গিগুলো জেলেদের। তারা জাল বিছিয়ে অপেক্ষা করছে। জালের দিকে নজর, কখন জালে মাছ উঠবে সেই দিকেই তাদের লক্ষ্য। ভাটার টানে জল ছুটছে, স্রোতের উল্টো দিকে জাল পেতে রেখেছে জেলেরা। বড় বড় পালতোলা নৌকাগুলো মাল বোঝাই বলেই মনে হয়। তাদের গন্তব্যস্থান হয়ত কলকাতা, অথবা ফলতা অথবা অন্য কোথাও। মাঝে মাঝে জলের বুকে ভেসে উঠছে জলজ কোন প্রাণী, তার দেহটা দেখতে না পেলেও যে আলোড়ন সৃষ্টি করছে তা থেকেই তার দেহের আকার অনুমান করা যায়। এক ঝাঁক বুনো পাখী নদী পেরিয়ে ওপারের দিকে উড়ে চলে গেল, ওদের আস্তানা বোধহয় দূরে সুন্দরবনের গভীরে। দিনের বেলায় খোলামেলা আকাশে বিহার করতে এসেছিল, সন্ধ্যার আগেই ফিরে চলেছে ওদের গৃহে। শান্তির আস্বাদ পাবে সেখানে। কলরব করে স্বজনদের মাঝে নিজের ও অপরের সুখবার্তা ওরা প্রচার করবে।

কিন্তু! কি ভাবছি! পাখীগুলোও তাদের সুখের আস্তানা চেনে, ক্লান্ত দেহটাকে টানতে টানতে নিয়ে যায় তার ঘরে। আর আমরা? আর ভাবতে পারছি না। নিজের মনেই বলে উঠলাম, সবই স্বপ্ন!

ভারতী হঠাৎ ব্যস্ততার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, কিসের স্বপ্ন?

বললাম, না। কিছু না।

ভারতী বিশ্বাস করল না। বলল, কিছু একটা ভাবছিলে। কি ভাবছিলে বল।

হাসলাম।

জীবনসঙ্গিনীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা তো সহজ নয় তবুও কেমন একটি অবহেলার ভাব দেখিয়ে বললাম, সব কিছুতেই কি তোমাব দরকার?

ভারতী গম্ভীর হয়ে গেল। তার মনের ব্যথা আমি বুঝি। সারাজীবন ধরে যে মানুষটি সুখ-দুঃখ বঞ্চনা-লাঞ্ছনা সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছে তাকে ওভাবে কক্ষচ্যুত করার চেষ্টা অমার্জনীয় অপরাধ। বিশেষ করে অপরের সামনে এভাবে তাকে বলাটা যে চরম অবমাননা সেটাও সে যেমন বোঝে, আমিও তেমন বুঝি।

মুখ ফিরিয়ে হেসে বললাম, রাগ কর না ভারতী। কি যে ভাবছিলাম তা নিজেই মনে করতে পারছি না। মনে হচ্ছিল, পেছনে ফেলে আসা দিনগুলো সত্যিই বুঝি স্বপ্ন।

অনেক দিন আগে একবার ভারতী বলেছিল, আমি যেন স্বপ্নরাজ্যে বাস করি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, হঠাৎ করে এটা মনে কেন হচ্ছে? ভারতী হাসতে হাসতে বলেছিল, দেখ, আমাদের জীবনে কবে যে যৌবন এসেছিল তা আমরা টের পাই নি। কবে যে যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্ব এল তাও টের পাই নি। কবে যে প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে বার্ধক্যের সিঁড়িতে পা দিলাম তাও বুঝতে পারি নি। আজ মনে হচ্ছে, আমাদের কোন জীবন ধর্মই ছিল না। এখনও নেই। সবই মনে হয় স্বপ্ন।

আজ নদীর কিনারায় বসে পাখীদের কলরব শুনতে শুনতে মনে হল, ওদের জীবনধর্ম তো আমার মত শুকিয়ে যায় নি। মুক্ত গগনের পাখীদেরও জীবন পরিপূর্ণ, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক গরীবহীন ভারতের নর-নারীর জীবনধর্ম ব্যর্থ, বঞ্চিত ও ব্যথিত। তাই স্বপ্ন মনে হয়েছে। ভারতীকে বলতে পারলাম না, কেন মনে হল সবই স্বপ্ন। সত্য শুধু ব্যর্থদীর্ণ মানুষের অশান্তির পরিবেশ যেখানে আছে হাহাকার, অনাহার, অত্যাচার, শোষণ, পেষণ আর বঞ্চনা!

ধীরানন্দের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমাকে এমন কোথাও নিয়ে যেতে পারেন যেখানে আমি পেতে পারি এমন কিছু মানুষ যারা বাঘের সঙ্গে

যেমন লড়াই করেছে ঠিক তেমনি লড়াই করেছে শোষক মানুষদের সঙ্গে।

ধীরানন্দ হেসে বলল, অনেক অনেক পাবেন। চলুন তা হলে। রাতের অন্ধকারে তাদের চেহারা দেখতে পাবেন না। দিনের আলোতে দেখতে হবে। ওরাই আজ আসবে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে।

নদীর কিনারা ছেড়ে গ্রামের পথ ধরলাম। ধীরানন্দ যেতে যেতে দেখাতে থাকে কোথায় কবে কার গৃহে আগুন দিয়ে গ্রামছাড়া করেছে জোতদাররা গরীব ভাগচাষীদের। তাদের একমাত্র অপরাধ সরকারী আইন ও সরকার প্রদত্ত অধিকার মূলে মাটির ওপর দাবী জানানো। আমি নীরবে দেখছি আর এগিয়ে চলেছি। সবাই শ্রোতা ও দর্শক। মতামত দেবার প্রয়োজন কারও ছিল না।

উঃ! কি বিভৎস ওই মুখখানা! মুখমন্ডল থেকে নাকটা ছিঁড়ে নিয়েছে। গালের একাংশ থেকে মাংস খামচে তুলেছে! মাথার একাংশ কেশহীন!

এই হল মানিক দাস। মধু সংগ্রহ করতে গিয়েছিল গভীর অরণ্যে। বাঘের সঙ্গে লড়াই করে কোন রকমে ফিরে এসেছিল। সঙ্গী আমির মোল্লা আর হেফাজত আলির দেহ খুঁজে পাওয়া যায় নি।

মানিক দাস কথা বলল। ভয়ঙ্কর গলার শব্দ। নাক না থাকলে শব্দ কতটা ভয়ঙ্কর হয় তা জানতে পেরেছিলাম সেই দিন।

মানিক দাস বলল, সারা দিন মধু সংগ্রহ করে সন্ধ্যাবেলায় নৌকায় ফিরে আসতাম। নৌকা বাঁধা থাকতো নদীর মাঝখানে। আমরা পাঁচজন ছিলাম নৌকাতে। সে রাতে আমির মোল্লা আর হেফাজত আলি শুয়েছিল নৌকার ছইয়ে। আমি আর বদন শুয়েছিলাম ছইয়ের তলায়। পিটার ছিল পাটাতনের তলায়।

জ্যোৎস্না রাত।

মিষ্টি বাতাস। রান্না খাওয়া শেষ করে আরামে ঘুমিয়েছিলাম। মাঝরাতে নদীর জলে শব্দ হল। মনে হল কে যেন সাঁতার দিয়ে এগিয়ে আসছে। এত রাতে কে আসবে! ঘুমের ঘোর তখনও কাটে নি। হঠাৎ নৌকা কাৎ হল। কে যেন নৌকায় উঠল। তারপর বিকট চিৎকার শোনা গেল। ছাদের ওপর থেকে আমিরের গলার শব্দ মনে হল।

আমি উঠে বসলাম।

হাতের কাছে ছিল কাঠ কাটার কুড়ুল। সেটা হাতে করে ছইয়ের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারী কোন বস্তু জলে পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। বদন ও পিটারের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। তাড়াতাড়ি আলো জ্বালতে চেষ্টা করছিল। আমি উঠে দাঁড়াতে দেখি প্রকান্ড এক বাঘ। আমির মোল্লাকে কামড়ে ধরেছে। নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হেফাজত আলি। তার চিৎকার শোনা গেল। তাকিয়ে দেখলাম হেফাজত জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। আমি কুড়ুল দিয়ে প্রচন্ড আঘাত করলাম বাঘকে। আমার তখন জ্ঞান ছিল না বললেই হয়, বাঘকে আঘাত করতে পেরেছিলাম কিনা মনে নেই। বাঘ সামনে বাধা পেয়ে আমার মুখে প্রচন্ড বেগে একটা থাবা মেরেই আমিরকে মুখে নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি পাটাতনের ওপর গড়িয়ে পড়েছিলাম।

জ্ঞান হল হাসপাতালে।

বদনের কাছে শুনেছি। হেফাজতকে টেনে নিয়েছে কুমীর আর আমীরকে শেষ করেছে বাঘ। আমার পরমায়ু ছিল তাই নাক-মুখ হারিয়ে এখনও বেঁচে আছি।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা তো বনবিবি-দক্ষিণরায়ের সিন্নি দিয়ে বনে যাও। তাতে তোমাদের কোন লাভ হয় কি?

মানিক বলল, লাভ হয় বাবু। আমরা জানি ওসব দেব দেবতার ক্ষমতা নেই বাঘের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করার, কিন্তু আমরা সিন্নি দেই মনের বলবৃদ্ধি করতে। আমাদের মনে তো ভয় থাকেই সেই ভয় যাতে আমাদের খেয়ে না ফেলে তার জন্যই আমরা পূজা সিন্নি দেই।

ধীরানন্দ বলল, এই হল অজয় সাহু। এর কথা শুনুন।

অজয় জওয়ান ছেলে। তিরিশি বত্রিশের মত বয়স। বেশ শক্ত সমর্থ দেহ। ধীরানন্দ পরিচয় করে দিতেই অজয় আমার দিকে পিঠ দিয়ে বসল। বলল, দেখুন।

দেখলাম তার পিঠে কালো কালো দাগ। দাগগুলো চামড়া যেন ভেদ করে রয়েছে।

ঘুরে বসে অজয় বলল, আমি জেলের কাজ করি। আমার একটা নৌকা আছে, জাল আছে। সারাদিন নদীতে মাছ ধরি। সেই মাছ নিয়ে হাটে হাটে যাই। এই আমার জীবিকা।

তোমার উপার্জন কত হয়?

কোন দিন তিন টাকা কোন দিন দশ টাকা। গড়ে ছয় টাকা উপায় হয়।

তোমার পোষ্য ক'জন?

বুড়ো মা, স্ত্রী আর তিনটি সন্তান! মোট ছয়জন। এই উপার্জনে কোন রকমে দিনাতিপাত হয়। তবে ঋণ আছে। ঋণের টাকা শোধ দিতে দিতে প্রায় ফতুর হবার উপক্রম।

ঋণ কেন?

ধীরানন্দ বলল, সেটাই তো শুনবেন। এই কথা বলতেই ওরা এসেছে।

অজয় সাহু বলল, আমার তো কোন জমিজমা নেই। হঠাৎ জমি পাবার নেশা জাগল মনে। আমার তো একটা নৌকা আর ছেঁড়া একটা জাল। আমার তো কোন ভবিষ্যত নেই। যে জমিতে আমার ঘর সেটাও মাত্র দেড় কাঠা। ভেবেছিলাম, একটু বেশি জমি হলে ঘর বানাব, সামনের মাটিতে আনাজের চাষ করব। তাতে আমার রুটিরুজির সমস্যা কিছু মিটবে।

জানেন দাদা, সরকার ভূমিহীনদের ভূমি দেবে শুনেই মাটির নেশা আরও চাঙ্গা হল। দরখাস্ত করলাম জে-এল-আর-ও অফিসে। সেই সরকার জাহান্নামে গেল, এল যুক্তফ্রন্ট। তারাও গেল। দরখাস্ত ধামা চাপা পড়ল। আবার এল কংগ্রেস সরকার। এবার তদ্বির করলাম। অনেক দৌড়াদৌড়ি করে উনিশ ডেসিম্যাল জমি পেলাম এই গ্রামের শেষ প্রান্তে। জমির দলিল পাওয়া মাত্র ঘর তুললাম। আনাজের চাষ আরম্ভ করলাম। এই সরকারও গেল। আবার ইলেকশন এল। বাহাত্তরের ইলেকশন। এবার ইলেকশনে কংগ্রেস কি করে ক্ষমতা পেল তা তো জানেন।

এই জমিটা ছিল হেমন্ত ভান্ডারীর। নতুন সরকার হতেই হেমন্ত কংগ্রেসের নেতাগিরি আরম্ভ করল। তার দলবলও জুটল।

একদিন দুপুরবেলায় হেমন্তের অনুচররা এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল হাটতলায়। গিয়ে দেখি আরও অনেকে সেখানে হাজির। আমার মত গরীব লোকরা হাটের আটচালার মেঝেতে বসে রয়েছে। হেমন্তের দলবল তাদের ঘিরে রেখেছে। আর কংগ্রেসী মাতব্বররা বেঞ্চে বসে। সমানে তর্কবিতর্ক চলছে।

ইস্তফা লিখে দিতে হবে। যারা জমি পেয়েছে তাদের ইস্তফা লিখে

জোতদারকে জমি ফেরত দিতে হবে। সরকার যে জমি দিয়েছে এ যুক্তি তারা মানতেই রাজি নয়।

হেমন্ত বলল, সরকার আমাদের। আমরাই সরকার। তোদের জমি ফেরত দিতেই হবে।

সবাই আপত্তি করেছিল। যারা চড়া গলায় আপত্তি করেছিল তাদের প্রকাশ্যে মারপিঠ করতে আরম্ভ করল। এমন সেই মারের বহর যার ফলে অনেকে অজ্ঞানও হয়ে গিয়েছিল। সেদিন অনেকেই ইস্তফা লিখে দিয়ে নিস্কৃতি পেল। অনেকে অঙ্গীকার করে সাময়িক নিস্কৃতি পেল।

এবার আমার পালা।

আমি বললাম, জমির ইস্তফা আমি দেব না। আমাকে মেরে ফেললেও দেব না। যে সরকার জমি দিয়েছে সেই সরকার যদি ফেরত চায় তবেই ইস্তফা দেব নইলে নয়।

তবে রে শালা।

এরপর যা হল তা আর বলার নয়। পাশের চায়ের দোকানে উনুন জ্বলছিল। লোহার শিক গরম করে তারই ছ্যাঁকা দিয়েছে আমার সারা পিঠে। সেই দাগই তো দেখালাম আপনাদের।

এখানেই শেষ নয় দাদা। সেই রাতে আমার বাড়িতে আগুন দিল, মাছ মারার জালটা চুরি করে নিয়ে গেল। উঠোনের আনাজ তরকারি গাছ নির্মূল করে দিল।

আমার তখন জ্ঞান ছিল না। মরে গেছি মনে করে নদীর ধারে একটা শুকনো গর্তে ফেলে রেখে হেমন্ত ভান্ডারী ও তার দলবল খুশী মনে যে যার ঘরে নিশ্চয়ই ফিরেছিল।

পরের দিন আমার জ্ঞান হবার পর কোন রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়িতে এসে দেখি বাড়ি আর নেই। আমার মা স্ত্রী ও সন্তানরা একটা অশ্বত্থ গাছতলায় বসে কাঁদছে।

আমি নিরুপায়।

সবাইয়ের হাত ধরে গেলাম থানায়। দারোগাবাবু বলল, তোরা এতদিন জোতদারের ওপর অত্যাচার করেছিস, এবার তোরা সহ্য কর। আমাদের কিছু করার নেই।

আমি ফিরে এলাম।

আশ্রয় নিলাম শ্বশুরের ঘরে।

দেহটা সুস্থ হলে ফিরে এলাম গ্রামে।

সবাই জানে আমি মরে গেছি। আমাকে দেখে অনেকেই আশ্চর্য হল। আমি কিন্তু উনিশ ডেসিমেল জমি ছাড়িনি। আমি হেমন্ত ভান্ডারীর চরম শত্রু নির্মল প্রামাণিকের কাছে জমিটা বিক্রি করে দিলাম। নির্মল অর্থবান লোক, তার সঙ্গে লড়াই করা সামর্থ্য নেই হেমন্তর। নির্মল জমিটা আবার আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। আবার ঘর তুলেছি সেই পোড়া ভিটেয়।

কিন্তু ঋণ করতে হয়েছে নতুন নৌকা করতে আর জাল তৈরি করতে। সেই ঋণ এখনও শোধ দিচ্ছি। নির্মলের মাটির নেশা থাকলেও সে দোকানদার। তাই জমির চেয়ে সুদের টাকার ওপর তার লোভ বেশি। সেজন্য জমি ফেরৎ দিতে আপত্তি করেনি, আর গোলমেলে জমি নিয়ে মামলা মোকদ্দমাও সে করতে নারাজ। যাই হোক, জমি এখনও আমারই আছে। আমার আনাজের চাষ এবারও হচ্ছে।

ধীরানন্দ বলল, একমাত্র অজয় ভিন্ন প্রায় সবাই বন্ড দিয়ে মাথা বাঁচিয়েছে দাদা। এমন কি, আমিও লিখে দিতে বাধ্য হয়েছি। জমির ইস্তফা সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিতে হয়েছে, কোনদিন আমরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোন কথা বলব না।

বললাম, আপনারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোন কথা নিশ্চয়ই বলেন না?

ধীরানন্দ বলল, সেদিন বাঁচার জন্য যা লিখে দিয়েছি তার মূল্য কতটুকু। আর ক্রমেই অবস্থা বদলাচ্ছে। ওদের দলেই তো ভাঙ্গন। যারা যু-যু জিও করত তারাই উল্টো কথা বলছে। আমরা তো সুযোগ পেলেই সরকারের অন্যায় কাজের সমালোচনা করবই।

অজয়কে বললাম, কদিন আমি বাদার অনেক জায়গায় ঘুরেছি। অনেক দুঃখ-দৈন্যের কথা, অত্যাচার অবিচারের কথা। শোষণ-পোষণের ঘটনা শুনেছি, দেখেছি কিন্তু তোমাদের কোন উপকার করার ক্ষমতা তো আমার নেই। তবু চেষ্টা করব, তোমাদের কথা যুক্তিবাদী সৎমানুষদের কাছে তুলে ধরতে। তারাই তোমাদের সাহায্য করবেন।

অজয় গদগদ ভাবে বলল, এটাও তো কেউ করে না। এদেশে কোন সরকার

আছে বলে আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। কতকগুলো চোর গুণ্ডার হাতে আমাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তারা আমাদের ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। আমরাও প্রস্তুতি নিচ্ছি। একবারের বেশি তো আমাদের মরতে হবে না। আঘাতকে আঘাত দিয়েই আমাদের রুখতে হবে দাদা।

বললাম, বোধহয় তাই। তবে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করলে ব্যর্থতা অনিবার্য। তার জন্য সঙ্ঘশক্তির প্রয়োজন। এটা যেন ভুলো না ভাই। দুঃখকে বড় করে না দেখে দুঃখের কারণটা আবিষ্কার করে তার সঙ্গে লড়াই করার প্রস্তুতি নাও। এটাই আমার কামনা।

রাতের বেলায় ভারতী বলল, এবার ফিরতি পথের বোধহয় শেষ।

হাঁ। কাল ঊষাকালে অজয় সাহু এসে আমাদের ডেকে নিয়ে যাবে। তার নৌকা করে উজানে নিরাপদ স্থানে আমাদের নামিয়ে দেবে। সেখান থেকে সহজেই আমরা ফিরতে পারব।

ভারতী হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে বলল, কে যেন কাঁদছে।

বললাম, না তো। তুমি ভুল শুনেছ।

তা হবে। সেই পাদরীর ঠাকুরমার কান্না শুনেছিলাম। সেই কান্নার শব্দ আজও কানে এসে ধাক্কা দেয়। কেমন অস্থির করে তোলে আমাকে।

ভারতের শতকরা আশীজন লোকের ঘরে কান্না। এই কান্নার অশ্রুতে নতুন জীবনের উদ্বোধন হবে ভারতী, সেজন্য অস্থির না হয়ে সুস্থির হও। ভুলে যেও না আমাদের আরও অনেক কিছু করা এখন শেষ হয়নি। ব্যক্তিগত মাটির ক্ষুধা না মেটা অবধি আমাদের কাজও শেষ হবে না। এদের চোখের জল মোছাবার শপথ নিয়েই কাল ফিরতি পথ ধরব।

আবার সকাল হল। ঘুম ভাঙ্গতেই তাকিয়ে দেখি পরম নিশ্চিন্ত মনে ভারতী পাশে শুয়ে আছে। তার একখানা হাত আলতোভাবে আমার বুকের ওপর বিছিয়ে দিয়েছে। তার মুখে পরম পরিতৃপ্তির ছাপ। মনে হল সেই ফেলে আসা জীবনের ঘটনা। কোন্ অতীতে এমনিভাবেই পরম পরিতৃপ্তি নিয়ে ভারতী আমার বুকের ওপর হাত বিছিয়ে শুয়ে থাকতো। কোন সময় হাত নামিয়ে দিলে অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে কত কি অভিযোগ অনুযোগ করত! আজ সেই জীবনটা হারিয়ে মনে হয় অনেক কিছু হারিয়েছি। নেবার ছিল অনেক অথচ দিতে দিতে নেবার অবসরটুকুও পাইনি জীবনে।

সকালে মিঠে আলোতে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। এমন সময় অজয় সাহুর গলার শব্দ পেয়ে ধরমর করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। ভারতীকেও ডেকে তুললাম। ততক্ষণে ইসুফ ও জয়াবতীও বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে।

বাইরে আসতেই অজয় সাহু বলল, আমি এসেছি দাদা। ঘাটে নৌকা প্রস্তুত।

তোমার আজ বুঝি কোন কাজ নেই?

কাজ, বলেই অজয় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণভাবে বলল, সারাজীবন তো পড়েই আছে। কাজের তো শেষ নেই, সময়েরও অভাব নেই। এক দিন কাজ না করলেও মরে যাব না।

বললাম, ঠিকই বলেছ অজয়। তবে জীবনটা তো মুহূর্ত দিয়ে বাঁধা, মুহূর্তের সমাহারেই জীবন, সেই জীবনে সামান্য মুহূর্তও কিন্তু আয়ু নিঃশেষের সঙ্কেত দেয়। সেজন্য একটা দিন কিন্তু খুব সামান্য কিছু নয়।

অজয় হেসে বলল, অতশত আমি বুঝি না দাদা। আপনারা প্রস্তুত হয়ে নিন। সূর্য মাথায় এলে চলার কষ্ট হবে। আপনাদের আমি মণিরতটে পৌঁছে দিয়ে তবে ফিরতি পথ ধরব।

ধীরানন্দ হন্তদন্ত হয়ে চায়ের বাটি এনে হাজির করল। তার পুত্রবধূ একটা থালায় মুড়ি আর কাঁচালঙ্কা এনে দিল। আমরা মুখ ধুয়ে সকালের ব্রেকফাস্ট শেষ করে বললাম, এবার রওনা হতে হয়। দেরী করে লাভ নেই।

ধীরানন্দ হাত কচলাতে কচলাতে বলল, আবার যদি কোন দিন এখানে আসেন তা হলে এই গরীবের ঘরে পায়ের ধুলা দেবেন।

হাকিম আলির কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় যেমন হেসেছিলাম আজও তেমনি একটা বিস্বাদভরা হাসি ফুটে উঠল আমার ঠোঁটে। মনের সঙ্গে তখন লড়াই করছি। হঠাৎ বললাম, অবশ্যই।

এরপর কাকেলা। সম্মুখে অজয় সাহু, সবার পেছনে ধীরানন্দ। মধ্যস্থলে আমরা চারজন। গ্রামের মানুষের সবে মাত্র ঘুম ভাঙ্গতে শুরু করেছে। নারকেল গাছের মাথার ফাঁকে সকালের তপন তাপ বিকীরণ করার চেষ্টা করছে। দুপাশের বাড়িগুলোতে সকালের ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কোথাও কারা যেন ঢেঁকিতে ধান ভানছে, সেই শব্দ ভেসে আসছে কানে। গাছের ডালে এক জোড়া ঘুঘু বসে মাঝে মাঝে ঘু-ঘু করে ডেকে উঠছে। গেরস্থবাড়ির

কুকুরগুলো আহার্যের আশায় আস্তাকুঁড়েতে ঘুর ঘুর করে ঘুরছে। আমাদের চলার পথের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখছে না। নবাগতদের যেমন অভ্যর্থনা করার কেউ নেই তেমনি বিদায় সম্ভাষণ জানাতেও কেউ নেই। সামাজিক বন্ধনের মধুর সূত্রগুলো যেন ছিঁড়ে গেছে। বেসুরো মনে হচ্ছে পরিবেশকে, যেন ছন্দ নেই, তাল লয় নেই। লাভ লোকসানের হিসাব করতে করতে যেন যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে এই গ্রাম্য জীবনধারা।

এগিয়ে চলেছি নদীর ঘাটের দিকে। সেখানে নতুন কাঠের জেটি তৈরি করছে সরকার, নতুন পথ তৈরি হচ্ছে ওপারে, এপারের পথের সঙ্গে সংযোগ করার মত কোন বন্ধন দেবার চেষ্টাও নেই।

জেটির ঘাটে অজয়ের ডিঙ্গি বাঁধা। নদীতে তখন পুরো জোয়ার। নদীর জল ফুলে ফেঁপে প্রায় কানায় কানায় ভর্তি। আমরা ধীরে ধীরে নৌকাতে উঠলাম। ধীরানন্দ হাতজোড় করে নমস্কার করল। আমরাও হাতজোড় করে তার সম্ভাষণ গ্রহণ করলাম।

নৌকার বাঁধন খুলতেই জোয়ারের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলল উজানে। এতক্ষণ কারও মুখে কোন কথা ছিল না। দেখতে দেখতে দলগোড়া গ্রামের সীমানা পেরিয়ে গেলাম।

প্রথম কথা বলল, অজয়।

বলল, আজকের জোয়ারে এক ঘন্টার মধ্যে মনিরতটে আপনাদের পৌঁছে দেব। আজ কোন্ তিথি বলতে পারেন?

বললাম, না। তিথির খবর তো রাখি না।

অজয় চুপ করে গেল।

জয়াবতীকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি সোনারপুর যাবে?

আমার প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক নয় তবুও প্রশ্নটা শুনে কেমন যেন বিগড়ে গেল জয়াবতী। বিরক্তির সঙ্গে বলল, না। আমিও মনিরতটে নামব। আপনারা যে পাড়ে নামবেন তার উল্টো পাড়ে নামব। ছেলেকে দেখতে যাব মনে করেছি।

আমাদের এই পরিক্রমায় ইসুফ প্রায়শই নীরব থেকেছে। আজ বোধহয় সুযোগ পেল প্রশ্ন করবার। বলল, দাদা তো মোটামুটি দেখলেন। আপনার ইম্প্রেশনটা কি হল?

কিসের সম্বন্ধে?

মানুষ, প্রকৃতি, পরিবেশ অর্থাৎ সুন্দরবনের আবাদ অঞ্চলের।

একটা রাক্ষসী ক্ষুধা যেন হা-হা করে তেড়ে আসছে সর্বত্র। কারও অন্নের ক্ষুধা, কারও মাটির ক্ষুধা, কারও অর্থের ক্ষুধা, কারও ক্ষমতার ক্ষুধা। এই ক্ষুধার নিবৃত্তি যেন নেই, অতৃপ্তি ক্ষুধাকে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি করে চলেছে। এর যেন শেষ নেই। তোমরা হয়ত মনে করছ সভ্য জগৎ থেকে এরা বিচ্ছিন্ন বলেই ক্ষুধার এই চরম কুৎসিত দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, আমার মনে হয়, সভ্যতা সৃষ্ট অসভ্যতার নখরে ক্ষতবিক্ষত বলেই এই সুন্দর প্রকৃতির কোলে কদর্যতা স্থায়ী আসন তৈরি করেছে।